بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা

বইটিতে আমরা বিশ্বের দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ধর্ম হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায় সে সকল বিষয়সমূহ অথবা উভয় ধর্মের জন্য প্রযোজ্য একই ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করব। এ বইতে যে বিষয়টি বর্ণিত তা পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতকে ভিত্তি করেই করা হয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ–

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

"হে নবী (সা)! আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ (কিতাবের অনুসারীগণ)। তোমরা এমন সব বিষয় সম্পর্কে আস যেগুলো তোমাদের এবং আমাদের মাঝে একইরূপ। আর সে বিষয়গুলো হচ্ছেঃ আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না, তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার করব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দেবো না। অতঃপর তারা যদি এ কথার প্রতি সম্মতি না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা তাদেরকে বল, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)।" -সূরা আলে-ইমরানঃ ৬৪

আমরা এতে করে একজন মানুষ একটি ধর্মের ব্যাপারে সঠিক ধারণা পাবে তা নিয়ে আলোচনা করবো। এর সাথে সাথে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

একটি ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার উপায়

ক. একটি ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ না করে ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে জানোঃ

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীরা তাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের বিশ্বাসকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলেছে। এ কথাটি হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মের ক্ষেত্রেও।

একটি ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জানার জন্য ঐ ধর্মমতের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা কোন ভাবেই সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ অনুসারীই তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। তাই কোন ধর্ম সম্বন্ধে জানার সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ঐ ধর্মের প্রকৃত উৎসসমূহ সম্পর্কে জানা অর্থাৎ, ঐ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

খ. ইসলামের প্রকৃত উৎসসমূহ ঃ মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং-আয়াতে ইরশাদ করেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ـ

"তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

-সূরা আলে-ইমরানঃ ১০৩

এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে মহামহিমান্বিতগ্রন্থ আল কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সতর্ক করেছেন যে, মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয়। আর তাদের ঐক্যের মূল কেন্দ্র হলো ইসলাম ধর্মের মূল উৎস মহিমান্বিত আল কোরআন। মাহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন আল কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথাও নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। যেমন, পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং তার রাসূল-এর এবং তোমাদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীলদের নেতৃত্বের আনুগত্য করো।' -সূরা নিসাঃ ৫৯

পবিত্র কোরআনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো– যাঁর উপর কোরআন নাযিল হয়েছে– সেই মহামানব নবী মুহাম্মদ (সা)- এর দেয়া ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। এভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সঠিক এবং উত্তম পন্থা হলো ইসলামের প্রকৃত উৎসসমুহ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া। আর তা হলোঃ মহিমান্বিত কোরআন (যা মহান আল্লাহ্‌র কথা) এবং কুরআনের ব্যাখ্যা তথা সহীহ্ হাদীসসমুহ (যা মহানবী (সা)- এর নিজস্ব উক্তি এবং অনুমোদন)।

গ. হিন্দুধর্মের প্রকৃত উৎসসমুহ ঃ

একইভাবে, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে জানতে হলে তার সঠিক উপায় হচ্ছে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত উৎসসমুহ সম্পর্কে জানা। আর তা হচ্ছেঃ হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থসমুহের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ গীতা ও পূরাণ অন্যতম।

বিশ্বের এ দুটো প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম। অর্থাৎ, ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে এ ধর্ম দুটোর প্রকৃত গ্রন্থসমুহ অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে হবে। তাই এগুলো সম্পর্কিত আলোচনা এ বইতে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা হবে।

ঘ. ঐসব সাদৃশ্যতার প্রতি নজর দিতে হবে যেগুলো সাধারণত অজ্ঞাত ঃ

আমাদের এ বইতে "ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্যতাসমুহ"– আমরা ঐসব সাধারণ সাদৃশ্যসমূহের আলোচনা করব না যেগুলো এ উভয় ধর্মের অধিকাংশ অনুসারীদের জানা যেমন, সর্বদা সত্য কথা বলা উচিৎ, মিথ্যা কথা বলা উচিৎ নয়, চুরি করা উচিৎ নয়, দয়ালু হওয়া উচিৎ, কারো নিষ্ঠুর হওয়া উচিৎ নয় ইত্যাদি। এর পরিবর্তে, আমরা ঐসব সাদৃশ্যসমুহই আলোচনায় আনব যেগুলো এ উভয় ধর্মের সকল অনুসারীদের সাধারণভাবে জানা নেই এবং এগুলো শুধুমাত্র তাদেরই জানা রয়েছে যারা তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছে।

ইসলামি পরিচিতি

১. ইসলামের সংজ্ঞাঃ

'ইসলাম' আরবি শব্দ। যার উৎপত্তি سَلْم থেকে। এর অর্থ হচ্ছে– শান্তি। অথবা سَلْم থেকে যার অর্থ হচ্ছে– 'ইচ্ছাকে আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করা।' সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলাম অর্থ হচ্ছে 'স্বীয় ইচ্ছাকে আল্লাহ তায়ালার সমীপে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।'

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা।" -সূরা আলে-ইমরানঃ ১৯

২. মুসলমানের পরিচয়ঃ

মুসলমান হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি তার সকল ক্ষমতা সামর্থকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করে। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় 'মুসলিম' শব্দটি রয়েছে। যেমন, সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন।

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

'তোমরা সাক্ষী থাক, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।'

৩. ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা ঃ

কিছু সংখ্যক লোকের একটি ভুল ধারণা রয়েছে; আর তা হচ্ছে ইসলাম সম্পূর্ণ নতুন একটি ধর্ম– যা ১৪০০ বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দ্বারা প্রতিষ্ঠা পায় বস্তুত, ইসলাম এমন কোন একক ধর্মের নাম নয়, যা হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রথম বারের মত উপস্থাপিত হয়েছে। এবং যে অর্থে তাঁকে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা যথার্থ নয়।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, মানুষের সম্পূর্ণ আনুগত্য কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। ইসলাম সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য মহান প্রভুর এমন একটি নির্দেশনা, যা সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই ধারাবাহিকভাবে প্রচার হয়ে আসছে। হযরত নূহ (আ), হযরত সোলাইমান (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ইব্রাহিম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য সকল নবীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর ইচ্ছায় আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই একই বিশ্বাস (আল্লাহর একত্ববাদ) ও রিসালাত এবং আখিরাত সম্পর্কে একই বাণী প্রচার করেছেন। এসব নবীগণ (আ) ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না– যা তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। বরং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের পূর্বসূরীদের প্রচারিত বিশ্বাস এবং বাণীর পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র।

যাহোক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মহান আল্লাহর কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর দ্বারা একই নির্ভেজাল আকীদা তথা ইসলামের পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করেছেন– এবং এটি তাঁর পূর্বে অন্যসব নবীরাই প্রচার করে গিয়েছিলেন। এ নির্ভেজাল বাণী ইতোপূর্বে সময়ের ব্যবধানে কলুষিত হয়ে গিয়েছিল

এবং বিভিন্ন সময় মানুষের দ্বারা বহুবিধ ধর্মে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ, তারা নানা ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে এ নির্ভেজাল আকীদায় ভেজাল ও ভ্রান্তিপূর্ণ আকীদার সংমিশ্রণ দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা এসব ভ্রান্ত আকীদার অপসারণ এবং ইসলামের সঠিক ও প্রকৃতরূপ মানবজাতির সম্মুখে তুলে ধরার জন্যে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেন।

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে আর কোন নবী নেই এবং সেহেতু তাঁর উপর এমন একটি মহাগ্রন্থ নাযিল হয়েছিল (মহিমান্বিত কোরআন), যার প্রতিটি শব্দকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যাতে তা পরবর্তীকালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য প্রতিটি মানুষের হেদায়াতের উৎস হিসাবে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। সুতরাং সকল নবীর প্রচারিত ধর্মই ছিল– "মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ" এবং এজন্য একটি মাত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাকে আরবিতে বলা হয় 'ইসলাম'। হযরত ইব্রাহিম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)ও মুসলমান ছিলেন। যেমন, আল্লাহ সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন।

"অতঃপর ঈসা (আ) তাদের মধ্যে কুফুরীর ব্যাপারে অবগত হয়ে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কারা আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হব। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছি। এবং সাক্ষী থেক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান।"

এছাড়া হযরত ইব্রাহিম (আ) সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন,

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"ইবরাহীম (আ) না ইহুদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। আর অবশ্যই তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।"

হিন্দু ধর্ম পরিচিতি

১. হিন্দুর পরিচয় ঃ

ক. ভৌগোলিক তাৎপর্যপূর্ণ 'হিন্দু' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যারা সিন্ধু নদের তীরে বাস করতো অথবা সিন্ধু নদের পানি দ্বারা সিক্ত হয় এমন এলাকায় বসবাস করে।

খ. ঐতিহাসিকদের মতে, এ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল হিমালয় পর্বতের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতে আগমনকারী পারস্যদের দ্বারা। আরবীয়রাও শব্দটি ব্যবহার করত।

গ. 'হিন্দু' শব্দটি ভারত সাহিত্যে কিংবা হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পূর্বে কোথাও উল্লেখ ছিল না। উক্ত তথ্যটি– "এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়নস এ্যান্ড ইথিকস ৬ঃ ৬৯০"-এ প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর– 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের ৭৪ ও ৭৫ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, খ্রিষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত 'হিন্দু' শব্দটি দ্বারা 'মানুষকে' বুঝানো হতো এবং এর দ্বারা কোনভাবেই নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানো হতো না। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে বুঝানোর জন্য 'হিন্দু' শব্দটির ব্যবহার নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালের ঘটনা।

ঙ. সংক্ষেপে বলতে গেলে 'হিন্দু' শব্দটি একটি ভৌগোলিক পরিভাষা যেটা 'সিন্দু' নদের তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয় অথবা যারা ভারতে বসবাস করে তাদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

২. হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ঃ

ক. হিন্দুধর্ম কথাটি 'হিন্দু' শব্দ থেকে এসেছে। নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া এটেনিকার ২০ঃ৫৮১-এ বলা হয়েছে– 'হিন্দুধর্ম' শব্দটি ইংরেজরা ইংরেজি ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবহার শুরু করে। এর দ্বারা হিন্দুস্থানের জনগণের বহুবিধ বিশ্বাসকে বুঝানো হয়। বৃটিশ লেখকরা ১৮৩০ সালে প্রথম 'হিন্দুধর্ম' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন। শব্দটি দ্বারা তারা মূলত ভারতের ঐসব সমবিশ্বাসের লোকদেরকে বুঝাতো যারা মুসলমান বা খ্রিস্টান নয়।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, 'হিন্দুইজম' বা হিন্দুতত্ত্ব শব্দটি একটি মিথ্যা পরিভাষা। আর 'হিন্দুধর্ম' বলতে 'সনাতন ধর্ম' কে বুঝানো হয়। সনাতন ধর্ম হচ্ছে একটি চিরন্তন ধর্ম অথবা এর দ্বারা বৈদিক ধর্মকে বুঝায় যার অর্থ– বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "এ ধর্মের অনুসারীরা 'বেদতত্ত্ববাদী' হিসেবে পরিচিত।"

এখন আমরা ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং ঐগুলোকে হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত মতবাদসমূহের সাথে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করে দেখবো। আমরা আরও যাচাই করবো ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কে কী কী মত দেয়া হয়েছে, এবং সেগুলো এই দুটি ধর্মের মধ্যে তুলনাও করে দেখবো।

৩. ইসলামে ঈমানের বিষয়বস্তু এবং ঐগুলোর সাথে হিন্দুধর্মীয় ধর্মগ্রন্থসমূহে প্রদত্ত ধর্মবিশ্বাসের তুলনাঃ

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মহিমান্বিত কোরআনের সূরা বাক্বারার ১৭৭ নং আয়াতে বলেছেন,

"পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন সৎকাজ বা ছওয়াব নিহিত নেই। বরং প্রকৃত সৎকর্ম বা পূণ্যের কাজ করছে ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহতে, শেষ বিচারের দিনে, ফেরেশতাসমূহে, আসমানী কিতাবসমূহে এবং নবীগণের উপর যথার্থ ঈমান এনেছে।"

সহীহ মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের কিতাবুল ঈমানের ৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে– "একজন লোক মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী (সাঃ)! ঈমান কী? উত্তরে নবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, ঈমান হচ্ছে তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি, পরকালের পুনরুত্থানের প্রতি এবং তোমার তাকদীরের ভালো মন্দের (অদৃষ্টের) প্রতি", সুতরাং ইসলামে ঈমানের বিষয়গুলো হচ্ছে –

১. তাওহীদ (ঈমানের প্রথম বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। আর তা হচ্ছে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা একক, চিরন্তন আল্লাহ তায়ালা।)

২. আল্লাহর ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস;

৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস;

৪. তাঁর নবীগণের উপর বিশ্বাস;

৫. পরকালের জীবনের উপর বিশ্বাস;

৬. অদৃষ্টের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস।

এখন, এ দুটো ধর্মে আল্লাহর অস্তিত্ব বা গুণাবলি সম্বন্ধে কী কী ধারণা দেয়া হয় তা ঐ ধর্ম দুটোর ধর্মগ্রন্থসমূহের বক্তব্যের নিরিখে তা আলোচনা করবো এবং ধর্ম'দুটির মাঝে কোন সাদৃশ্য রয়েছে কিনা তাও পর্যালোচনা করবো। প্রথমে আমরা হিন্দুধর্মে প্রভু সম্পর্কিত যেসব বক্তব্য আছে তা আলোচনা করবো।

হিন্দু ধর্মে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

আপনি যদি কোন সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা কতজন খোদায় বিশ্বাস করে? তাদের কেউ উত্তর দেবে তিনজন। কেউ বলবে, তেত্রিশজন। আবার কেউ কেউ বলবে, এক হাজার জন। কেউ কেউ হয়তো এও বলতে পারে, তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ ৩৩০ মিলিয়ন। কিন্তু যদি আপনি এ প্রশ্নটি কোন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন, যিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক অবহিত– তাহলে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলবেন, একজন এবং প্রকৃতপক্ষেই একজন প্রভুতে বিশ্বাস করেন এবং শুধুমাত্র একজন খোদারই উপাসনা করেন।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সম্বন্ধবাচক শব্দ ব্যবহারে

ইসলাম বলে, Everything is god's অর্থাৎ সবকিছুই মহান আল্লাহর (সৃষ্টি)। অন্যদিকে, হিন্দুধর্ম বলে, Everything is god অর্থাৎ সবকিছুই প্রভু।

একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো– একজন সাধারণ হিন্দু সর্বেশ্বরবাদের দর্শনে বিশ্বাসী। অর্থাৎ, সে বিশ্বাস করে, "সবকিছুই প্রভু, গাছ, সূর্য, চন্দ্র, সাপ, বানর, মানুষ, সকল জাতিরই একজন প্রভু।" অপরদিকে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, 'এসব কিছুই আল্লাহর (সৃষ্টি)।'

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, সবকিছুই প্রভুর সৃষ্টি। অর্থাৎ, সবকিছুই প্রভুর সাথে স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্কে সম্পর্কিত। সবকিছুই এক এবং একমাত্র একক চিরন্তন সত্তার মালিকানাধীন। গাছের মালিক প্রভু, সূর্যের মালিকও প্রভু, চন্দ্রের মালিকও প্রভু, সাপের মালিকও প্রভু, বানরের মালিকও প্রভু, মানুষের মালিকও প্রভু অর্থাৎ সকল সৃষ্টির মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

এভাবে হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমানদের ধর্ম তথা ইসলামের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 'সম্বন্ধবাচক' শব্দের ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। হিন্দুরা বলেন, "সবকিছুই প্রভু"। আর মুসলমানরা বলেন, "সবকিছুই প্রভুর।" আমরা যদি সম্বন্ধবাচক শব্দের ব্যবহারজনিত সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে পৃথিবীতে হিন্দু এবং মুসলমানরা এক হয়ে যাবে। তাদের মাঝে কোন বিভেদ থাকবে না।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ.

"তোমরা এমন সাধারণ বিষয় সম্পর্কে আস– যা তোমাদের এবং আমাদের মাঝে সমান। শর্ত হচ্ছে এই যে, বলো আমরা একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করবো না।"

সুতরাং আমাদেরকে এমন সব সমান বিষয়ের প্রতি আলোচনা করা দরকার যেগুলো ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহে বিশ্লেষণের সাহায্যে পাওয়া যায়।

উপনিষদ

উপনিষদ হচ্ছে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

১. চান্দগোয়া উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ২নং সেকশনের ১নং ধারায় বলা হয়েছে- Ekam Evadvitiyam অর্থাৎ, "তিনি এক, একমাত্র একক এবং অদ্বিতীয়।" (রাধাকৃষ্ণের রচিত মল উপনিষদের ৪৪৭ এবং ৪৪৮ নং পৃষ্ঠা, প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ, খণ্ড- ১, উপনিষদ, ১৯ অংশের ৯৩ নং পৃষ্ঠা)

২. সুভাস ভাট্টারা উপনিষদের ৬ নং অধ্যায়ের ৯ নং ধারায় বর্ণিত হয়েছে- Na-casya Kascij Janita na cadhipah অর্থাৎ, "তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং তাঁর কোন প্রভুও নেই"। (রাধাকৃষ্ণ রচিত মূল উপনিষদের ৭৪৫ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড- ১৫, উপনিষদ, ২য় অংশের ২৬৩ নং পৃষ্ঠা)

৩. সুভাস ভাট্টারা উপনিষদের ৪নং অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায় রয়েছে- Na-tasya pratima asti. অর্থাৎ, "তাঁর মত আর কেউ নেই।" (রাধাকৃষ্ণ রচিত মূল উপনিষদের ৭৩৬, ৭৩৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড, - ১৫, উপনিষদ ২য় অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠা)

৪. সুভাস ভাট্টারা উপনিষদের ৪নং অধ্যায়ের ২০ নং ধারায় আরো রয়েছে যে- Na-samdrse tisthati rupam asya na caksusa pasyati Kas canainam. অর্থাৎ, "তাঁর আকার দেখা যায় না, কেউ তাঁকে চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখতে পায় না।" (রাধাকৃষ্ণ রচিত মূল উপনিষদ ৭০৭ নং পৃষ্ঠা এবং প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থসমূহ খণ্ড- ১৫, উপনিষদ ২নং অংশের ২৫৩ নং পৃষ্ঠা)

ভগবদগীতা

হিন্দু ধর্মের যতগুলো ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে ভগবদগীতা হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ৭ঃ ২০-এ বলা হয়েছে-

"যাদের বুদ্ধি-জ্ঞান পার্থিব কোন বস্তু লুপ্ত হয়েছে তারাই উপদেবতার উপসনা করে।" অর্থাৎ, "বস্তুবাদীরাই কেবল উপদেবতার উপসনা করে।"- এ কথার অর্থ হচ্ছে বস্তুবাদীরা সত্য প্রভুকে ছেড়ে প্রতিমার উপসনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখে।

এছাড়া ভগবদ গীতার ১০ঃ৩ বর্ণিত আছে-

"তিনি সেই সত্ত্বা যিনি জন্মের পূর্ব থেকেই আমাকে জানেন, যাঁর কোন আদি বা অন্ত নেই- তিনি হচ্ছেন জগৎসমূহের মাঝে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু।"

ইয়াজুর বেদ

বেদ হচ্ছে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। মৌলিকভাবে বেদ ৪ প্রকারঃ ভাগগুলো হচ্ছে ঃ রিগ বেদ, ইয়াজুর বেদ, শ্যাম বেদ এবং অথর্ব বেদ।

১. ইয়াজুর বেদের ৩২ অধ্যায়ের ৩নং ধারায় রয়েছে- "na tasya pratima asti" অর্থাৎ, "তাঁর সম্বন্ধে কোন কল্পনা করা যায় না।" এতে আরও রয়েছে, "তিনি এমন সত্ত্বা যিনি জন্মগ্রহণ করেননি, এবং তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।" (ইয়াজুর বেদ ৩২ঃ ৩) (দেবী চাঁদ এম. এ. কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ-পৃষ্ঠা নং ৩৭৭)

২. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮নং ধারায় রয়েছে– "তিনি হচ্ছেন নিরাকার এবং বিশুদ্ধ।" (র‍্যালফ আই, এইচ, গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ-পৃষ্ঠা নং ৫৩৮)

৩. ইয়াজুর বেদের ৪০ নং চ্যাপ্টারের ৯নং ধারায় আছে– "সে অন্ধকারে প্রবেশ করে, যে প্রাকৃতিক কোন বস্তুর উপাসনায় লিপ্ত।" যেমন, প্রাকৃতিক কোন বস্তু– বায়ু, পানি, আগুন, সূর্য এবং চন্দ্র ইত্যাদি কোন প্রাকৃতিক বিষয়ের উপাসনা করা।

এতে আরো আছে, "তারা গভীর মূর্খতায় নিপতিত যারা সৃষ্টির উপাসনা করে। যেমন– টেবিল, চেয়ার, পুতুল ইত্যাদি তৈরিকৃত জিনিসের উপাসনা করা।" (র‍্যালফ আই, এইচ, গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত ইয়াজুর বেদ শ্যামহিতা এর পৃষ্ঠা নং ৫৩৮)

অথর্ব বেদ

১. অথর্ব বেদের ৫৮ নং অধ্যায়ের ৩নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে– 'প্রভু অত্যন্ত মহান'। (অথর্ব বেদের খণ্ড-২ উইলিয়াম ড্রুইট-হিটটি, পৃষ্ঠা নং ৯১০)

রিগ বেদ

১. রিগ বেদ বই নং-১, স্তুতিগান নং ৬৪, ধারা-৪৬-এ উল্লেখ রয়েছে "মহাজ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডাকে।"

সত্য ধর্ম এক, প্রভু একক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকেন। এ একই কথা বলা হয়েছে রিগ বেদের বই নং-১০, স্তুতিস্তাবক- ১১4 ধারা -৫ এ।

২. রিগ বেদের বই-২ স্তুতিস্তাবক- ১ মতে রিগ বেদে মহাপরাক্রম প্রভুর কমপক্ষে ৩৩টি গুণাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব গুণাবলির অধিকাংশের বর্ণনাই রিগ বেদের বই-২, স্তুতিস্তাবক-১ রয়েছে।

ক. ব্রহ্ম = স্রষ্টা = খালিক ঃ

রিগ বেদ বই-২ স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-৩ এর মতেঃ রিগ বেদে স্রষ্টার সকল গুণাবলির কথা বর্ণিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রভুর অন্যতম সুন্দরতম গুণ হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থ স্রষ্টা। এর আরবী অনুবাদ হচ্ছে 'খালিক'। ইসলাম ধর্ম মহান সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে খালিক, স্রষ্টা বা ব্রহ্মা বলে ডাকতে বারণ করে না। কিন্তু কেউ যদি বলে ব্রহ্ম, তথা সর্বশক্তিমান প্রভুর- চারটি মাথা রয়েছে এবং প্রতি মাথায় একটি মুকুট এবং চারটি হাত রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপক আপত্তি রয়েছে, এসব ধারণা করতে ইসলাম বারণ করে। কারণ, এ ধরনের বর্ণনা প্রভু সম্পর্কে মানুষের মনে কল্পনার সৃষ্টি করে। আর হিন্দুদের উক্ত বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৩২নং অধ্যায়ের ৩নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা সেখানে বলা হয়েছে– "তাঁর সম্বন্ধে কল্পনাও করা যায় না।"

খ. বিষ্ণু = পালনকর্তা = রবঃ রিগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা৩ঃ রিগ বেদে প্রভুর অন্য একটি সুন্দর গুণাবলির কথা বলা হয়েছে। বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-৩, এ উল্লেখ রয়েছে যে, বিষ্ণু। যার অর্থ হচ্ছে রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা। শব্দটির আরবীতে অনুবাদ দাঁড়ায় 'রব'। আর কেউ যদি সর্বশক্তিমান প্রভুকে 'রব' 'রক্ষাকর্তা' কিংবা 'বিষ্ণু' হিসেবে আখ্যায়িত করে তবে তাতে ইসলামের কোন রূপ আপত্তি নেই। কিন্তু এখন যদি কেউ বলে

যে, বিষ্ণুই হচ্ছে সর্বশক্তিমান প্রভু এবং এই বিষ্ণুর চারটি হাত রয়েছে, ডান দিকের হাতদ্বয়ের একটি হাত দ্বারা শঙ্খ বর্ম ধরে আছেন এবং বিষ্ণু পাখি কিংবা সাপের ছোবলের সামনে বাহনে উপবিষ্ট– তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামের ঘোর ও সীমাহীন আপত্তি আছে। কারণ, বিষ্ণুর এ ধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান প্রভুর আকৃতি সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে। আর এ বর্ণনা ইয়াজুর বেদের ৪০ নং চ্যাপ্টারের ৮নং ধারার বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩. রিগ বেদের বই-৮, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১ এ বলা হয়েছে- ! "তিনি (প্রভু) ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করো না। তিনি একমাত্র স্বর্গীয়। শুধুমাত্র তারই প্রশংসা করো।" (রিগ বেদ খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১ এবং ২)

৪. রিগ বেদের বই-৫, স্তুতিস্তাবক-৮১ ধারা-১ এ বলা হয়েছে– "সত্যিই স্বর্গীয় স্রষ্টার গৌরব অত্যন্ত সুমহান।" (রিগ বেদ, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- নং ১৮০২ এবং ১৮০৩)

৫. রিগ বেদের বই-৬, স্তুতিস্তাবক-৪৫, ধারা-১৬ এ বলা হয়েছে– "তাঁরই প্রশংসা করো যিনি অতুলনীয় এবং একক।" (র‍্যাঙ্ক টি. এইচ. গ্রিফিথ কর্তৃক রচিত রিগ বেদ পৃষ্ঠা নং ৬৪৮)

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে– "সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র একজন এবং দ্বিতীয় কোন দেবতা নেই। বর্তমানেও নেই। কখনও ছিল না এবং কখনও হবে না।"

উপরে বর্ণিত সবগুলো ধারা এবং অধ্যায় ও উদ্ধৃতি হিন্দু ধর্মের প্রকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে আনা হয়েছে। এসব ধারা স্পষ্টভাবে পরম ক্ষমতাবান স্রষ্টা সর্বশক্তিমান প্রভুর একত্ব এবং অদ্বিতীয়তার প্রমাণ বহন করে। অধিকন্তু, এসব ধারা সত্য প্রভু একক আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য দেবতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে সত্যিই তারা অস্তিত্বহীন। এসব ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাকে স্পষ্ট করে দেয়।

ইসলামে প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

মহাগ্রন্থ আল কোরআন একেশ্বরবাদ তথা তৌহিদের ধারণাই বর্ণনা করে। সুতরাং আপনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে প্রভু তথা আল্লাহর ধারণা সম্পর্কিত বক্তব্যের মাঝে সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন।

ক. ব্যাখ্যাসহ সূরা ইখলাস ঃ

ইসলামের মতে, মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসে দেয়া হয়েছে। যেমন, সূরা নং ১১২, সূরা ইখলাস আয়াত- ১-৪ এ বলা হয়েছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"হে নবী (সাঃ)! আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ যিনি এক এবং একক। আল্লাহ চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

এখানে 'আসসামাদ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে– চিরন্তন অস্তিত্ব হওয়ার গুণটি শুধুই আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং বিশ্বে অন্যসব প্রাণীর অস্তিত্ব ক্ষণকালের। এর আরও অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং অন্য সকল ব্যক্তি এবং সৃষ্ট বস্তুই তার ওপর নির্ভরশীল।

সূরা ইখলাস ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর

সূরা ইখলাস অর্থাৎ আল কোরআনের ১১২ নং সূরাটি হচ্ছে ধর্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর। 'Theo' শব্দটি গ্রীক- যার অর্থ হচ্ছে প্রভু এবং 'logy' অর্থ হচ্ছে তত্ত্ব এভাবে Theology অর্থ হচ্ছে প্রভুতত্ত্ব এবং সূরা ইখলাস হচ্ছে প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর।

যদি আপনি কোন স্বর্ণ বা মূল্যবান কোন ধাতুর বা পাথরের অলংকার ক্রয় বা বিক্রয় করতে চান তাহলে আপনাকে সর্বপ্রথম এটাকে যাচাই করে নিতে হবে। এ ধরনের অলংকারের যাচাই-বাচাই ও পরীক্ষা নিরিক্ষা শুধুমাত্র স্বর্ণকারের কষ্টিপাথরের মাধ্যমেই করা সম্ভব। স্বর্ণ অলংকার কষ্টিপাথরের সাথে ঘষে ঘর্ষণকৃত পাথরের রংয়ের সাথে তুলনা করে দেখবে। এটার রং ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের রঙের ন্যায় উজ্জ্বল হলে স্বর্ণকার আপনাকে বলবে যে আপনার অলংকারে ব্যবহৃত স্বর্ণ হচ্ছে ২৪ ক্যারেট প্রকৃত স্বর্ণ। যদি এটি উচ্চ গুণসম্পন্ন প্রকৃত স্বর্ণ না হয় তাহলে সে আপনাকে বলবে যে- এটা হয়তো ২২ ক্যারেট স্বর্ণ, নয়তো ১৮ ক্যারেট স্বর্ণ অথবা এটা আদৌ স্বর্ণ নয়। এটা হতে পারে জাল কারণ, কথায় বলে- 'চকচক করলেই সোনা হয় না।'

তেমনি সূরা ইখলাস (পবিত্র কোরআনের ১১২ নং সূরা) হচ্ছে প্রভুতত্ত্বের কষ্টিপাথর- যার মাধ্যমে এ সত্য যাচাই করা যায় যে, তুমি যে প্রভুর ইবাদাত করছ তিনি প্রকৃত প্রভু নাকি মিথ্যা প্রভু। কারণ, সূরা ইখলাস হচ্ছে কোরআনে প্রদত্ত সর্বশক্তিমান প্রভুর চার লাইনে দেয়া সর্বোত্তম পরিচয়। যদি কেউ সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবী করে তাহলে তাকে এ চার লাইনের পরিচয়ের প্রতি দৃঢ়তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হবে। আমরা মুসলমানরা দেবতা বলতে আল্লাহকে বুঝি। মহিমান্বিত কোরআনের সূরায় ইখলাস হচ্ছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটা 'ফুরকান' যা সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। যেটা সত্য প্রভু এবং মিথ্যা প্রভুত্বের দাবীদার খোদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অতএব পৃথিবীতে মানুষ যেসব দেবতার উপাসনা করে সেসব দেবতা যদি পবিত্র কোরআনের এ সূরায় বর্ণিত গুণাবলির আলোকে আলোকিত হয়, তবেই তার উপাসনা করা অর্থবহ এবং সে দেবতাই প্রকৃত প্রভু।

খ. প্রভুর গুণাবলি ঃ

মহান আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামসমূহের অধিকারী।

১. পবিত্র কোরআনের ১৭ নং সূরার ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

"হে নবী (সাঃ)! আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহকে 'রহমান' নামে ডাক। তবে তাঁকে তোমরা যে নাম ধরেই ডাকো না কেন (সেটাই উত্তম)- তিনি সবচেয়ে সুন্দরতম সুন্দর নামসমূহের অধিকারী।"

আল্লাহকে যেকোন নামে ডাকা যাবে তবে সে নামটি অবশ্যই সুন্দর হতে হবে এবং সে নামটি এমন হওয়া উচিত নয় যে, তাতে মানসিকভাবে প্রভুর কোন কল্পনা অঙ্কিত হয়।

মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এসব গুণবাচক নামের মধ্যে- আর রহমান, আর রাহীম, আল কাইয়ুম, আল হাকীম অর্থাৎ, পরম দয়াবান, পরম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ ইত্যাদি। এতসব গুণবাচক

নামের মধ্যে একটিমাত্র নাম হিরন্ময় আর সেটা হচ্ছে 'আল্লাহ'। পবিত্র কোরআন বাণীটির পুনরাবৃত্তি করেছে যে, আল্লাহ সুন্দরতম নামসমূহের অধিকারী।

সূরা আল আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নাম ধরেই ডাকো, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তোমরা তাদেরকে ত্যাগ করো, শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।"

সূরা ত্বা-হার ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে– اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۔ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۔

"আল্লাহ, তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ্ নেই, সুন্দর সুন্দর নামসমূহ তাঁরই।"

সূরা আল হাশরের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবলপরাক্রম, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তাদের শরীক স্থির করা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।

তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

গ. 'আল্লাহ' নামটি 'গড' নামের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয়।

মুসলমানরা সর্বশক্তিমান প্রভুকে ইংরেজি শব্দ 'গড' এর পরিবর্তে 'আল্লাহ' নামে ডাকতেই পছন্দ করে। আরবি আল্লাহ শব্দটি খাঁটি এবং স্বতন্ত্র্য আর এটি ইংরেজি শব্দ 'গড'- এর মত নয়। নিম্নে 'গড' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হলো–

যদি 'গড' শব্দটির সাথে 's' যোগ করা হয় তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Gods যেটা God শব্দের বহুবচন অথচ মহান আল্লাহ হলেন এক এবং একক। তাই 'আল্লাহ' শব্দের বহুবচন কখনোই হয় না। যদি God শব্দের সাথে ess যোগ করা হয় তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় Godess যা God শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ। অথচ আল্লাহ লিঙ্গ নির্ধারণ থেকে পবিত্র। আল্লাহর কোন লিঙ্গ নেই। আবার যদি God শব্দের সাথে Father শব্দটি যোগ করা হয় তাহলে শব্দটি দাঁড়ায় 'Godfather' যার অর্থ অভিভাবক যেমন, He is my Godfather. এর অর্থ হচ্ছে– সে আমার অভিভাবক। কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ আব্বা' কিংবা 'আল্লাহ ফাদার' বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে God শব্দের পূর্বে tin শব্দটি যোগ করলে দাঁড়ায় Tingod যার অর্থ হলো মিথ্যা প্রভু। কিন্তু ইসলামে 'মিথ্যা আল্লাহ' কিংবা 'জাল আল্লাহ' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ শব্দটি একটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দ। এটি দ্বারা মানসপটে কল্পনীয় কোন কিছুর চিত্রাংকন করতে পারে এমন কিছুকে বুঝায় না। আর এর পূর্বে কিংবা পরে কোন শব্দ বা শব্দাংশ যোগ করা যায় না। তাই মুসলমানের সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে বোঝাতে 'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহারকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। কিন্তু হয়তো মাঝে মাঝে তারা যখন অমুসলিমদের সাথে আলোচনা বা বিতর্ক করে তখন আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে অপূর্ণাঙ্গ শব্দ God-এর ব্যবহার করে থাকে।

'আল্লাহ' শব্দটির ব্যবহার হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায়

'আল্লাহ' শব্দটি– যা দ্বারা আরবিতে সর্বশক্তিমান প্রভুকে বুঝানো হয়, তার উল্লেখ নিম্নোক্ত হিন্দু ধর্মগ্রন্থসহে ও দেখা যায়। যেমন–

- রিগ বেদ বই-২, স্তুতিস্তাবক-১, ধারা-১১
- রিগ বেদ বই-৩, স্তুতিস্তাবক-৩০, ধারা- ১০
- রিগ বেদ বই-৯, স্তুতিস্তাবক-৬৭, ধারা- ৩০
- একটি উপনিষদ আছে যার নামই হলো ALO উপনিষদ।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের সমর্থক আয়াতসমূহ

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইসলামের বক্তব্য অনুযায়ী প্রভুর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় কোরআনের ১১২ নং সূরার ১-৪ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। যেমন–

"হে নবী (সাঃ) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক এবং একক। তিনি চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে এমন অনেকগুলো অনুচ্ছেদ বিদ্যমান যেগুলো পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাসের মর্মার্থের সমর্থক। যেমন–

ইসলাম	হিন্দুধর্ম
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ বলুন, তিনি আল্লাহ, এক এবং একক (সূরা ইখলাস)	তিনি শুধুমাত্র একজন এবং অদ্বিতীয়। (চান্দগোয়া উপনিষদ ৬ঃ ২ঃ ১)
اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ আল্লাহ চিরন্তন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী আদি। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। (সূরা ইখলাস)	তিনি সেই সত্ত্বা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর কোন আদি নেই, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু। (ভগবদ গীতা ১০ঃ ৩) এবং "তাঁর কোন পিতা -মাতা নেই, নেই কোন প্রভু (সুবাসবাট্টারা উপনিষদ ৬ঃ৯)
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔ আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস)	তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুবাসভাট্টারা উপনিষদ ৪ঃ১৯ আর ইয়াজুর বেদ ৩২ঃ৩)

স্মরণীয় যে, হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসূত্র পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে– Ekam Brahm, devitity naste nah na naste kinchan

"সৃষ্টিকর্তা শুধুমাত্র একজন, দ্বিতীয় কোন দেবতার অস্তিত্ব নেই। আদৌ নেই, কখনও ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবে না।"

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে ফেরেশতাদের ধারণা

এখন, আমরা এ দুটি প্রধান ধর্মে প্রভুর দূত তথা ফেরেশতা সম্পর্কিত বিশ্বাসের সত্যতা যাচাই-বাচাই করে দেখবো এবং এতদুভয়ের মাঝে কোন সাদৃশ্য আছে কিনা তাও খুঁজে দেখবো।

ইসলামে ফেরেশতা ঃ

ফেরেশতারা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি। তারা নুরের তৈরি এবং সাধারণত এদেরকে দেখা যায় না। তাদের নিজেদের ইচ্ছায় কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই এবং তারা সর্বদা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ পালনে নিয়োজিত থাকেন। নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় তারা আল্লাহর কোন নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফেরেশতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নিযুক্ত আছেন। যেমন, হযরত জিবরাঈল (আ.) এর কাজ আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

যেহেতু ফেরেশতারা প্রভুর সৃষ্টি, তাই তারা প্রভু নয়। মুসলমানরা ফেরেশতাদের উপাসনা করে না।

হিন্দুধর্মে ফেরেশতা ঃ

হিন্দুধর্মে 'ফেরেশতা' সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে, হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, একশ্রেণীর দেবদূত আছে– তারা এমন সব কাজ করতে পারে যেগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এসব হিন্দুদের কেউ কেউ দেবতার ন্যায় এসব দেবদূতের উপাসনা করে।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে কিতাব নাযিলের ধারণা

এখন, আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে মানব জাতির দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ কিতাব নাযিলের ব্যাপারে যেসব তথ্য রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখবো।

ইসলাম ধর্মে কিতাব সমূহ

ইসলামে কুরআন নাযিলের ধারণা

১. আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক যুগেই কিতাব নাযিল করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা রাদ-এর ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন– لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ -

"প্রত্যেক যুগেই একটি কিতাব নাযিল হয়েছিল।"

২. পবিত্র কোরআনে চারটি প্রধান আসমানী গ্রন্থের নাম উল্লেখিত হয়েছে। যুগে যুগে বিশ্ব মানবতার পথ নির্দেশনা দেবার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বেশ কিছু কিতাব নাযিল করেছেন। পবিত্র কোরআনের মাত্র চারখানা কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। এগুলো হলোঃ যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন শরীফ। যাবুর হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর নাযিলকৃত ওহী ছিল। তাওরাতও হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিলকৃত ওহী ছিল। ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ.) -এর ওপর নাযিলকৃত ওহী ছিল। কোরআন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত ওহী– আর এটা নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত রাসূল মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- এর ওপর।

৩. পূর্ববর্তী সবগুলো আসমানী কিতাবই শুধুমাত্র একদল নির্দিষ্ট মানুষের নিকট-নির্দিষ্ট সময় এবং যুগের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। কোরআন নাযিলের পূর্বে নাযিলকৃত সব আসমানী কিতাবই নির্দিষ্ট সময়ের এবং নির্দিষ্ট মানুষের হেদায়াতের জন্য এসেছিল।

৪. কোরআন সমগ্র জাতীর হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছিল। যেহেতু কোরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নাযিলকৃত আসমানী কিতাব তাই এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং এটা সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। এছাড়া কোরআন শুধুমাত্র মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ)- এর যুগের মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়নি বরং এটা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে।

ক. পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহিমের ১নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

"আলিফ লাম রা। আমি আপনার উপর এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি– যার মাধ্যমে আপনি সমগ্র মানবজাতিকে গাঢ় অন্ধকার পথ হতে আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে আসতে পারেন। তাদের প্রভুকে ত্যাগ করে সে প্রভুর পথে– যিনি পরাক্রমশালী এবং চির প্রশংসিত।"

যেহেতু এটা হচ্ছে শেষ বিচার দিন পর্যন্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা সেজন্য তা অবিকল বলবৎ থাকবে। সুতরাং এর যথার্থতা এবং পবিত্রতা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এজন্যই পবিত্র কোরআনের সূরা আল হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা দেন – إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

"নিশ্চয়ই আমি এ যিকর (কিতাব) নাযিল করেছি এবং (একমাত্র) আমিই এর (যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে) হেফাযতকারী।"

খ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সূরা ইব্রাহিমের ৫২ নং আয়াতে বলেন–

"এটা মানবজাতির জন্য প্রেরণকৃত বাণী। যাতে এর দ্বারা মানবজাতিকে সতর্ক করা যায় এবং তাদের নিকট এ কথা পৌছানো যায় যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র মাবুদ এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"

গ. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেছেন–

"রমজান এমন একটি মাস, যাতে পবিত্র কোরআন নাযিল করা হয়েছিল। যা সমগ্র বিশ্বমানবতার হেদায়াতের জন্য পথ প্রদর্শক, হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং এটা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী।"

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালা পুনরায় পবিত্র কোরআনের সূরা যুমারের ৪১ নং আয়াতে বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ .

"নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর সমগ্র মানবজাতির (সঠিক নির্দেশনার) জন্য সত্য কিতাব নাযিল করেছি।"

আল কোরআন হচ্ছে প্রভুর কথা। এটা ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নাযিলকৃত গ্রন্থ। এটি ইংরেজি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর নাযিল হয়েছিল।

৫. পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থে কোরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং অন্যান্য ধর্মেও কোরআনের কথা উল্লেখের প্রমাণ পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনের সূরা শুয়ারার ১৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِيْنَ .

"নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী লোকদের জন্য প্রেরিত কিতাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল।"

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বর্ণনা এবং এটা মহান আল্লাহর যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব তার উল্লেখ পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যান্য সকল ধর্মেই পাওয়া যায়।

হাদীস ঃ কোরআনের পর ইসলামের অন্য যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তার নাম হাদীস। হাদীস হচ্ছে মহানবী (সাঃ)- এর কথা এবং ঐতিহ্যের সমষ্টি। এসব হাদীস হচ্ছে মহিমান্বিত কোরআনের পরিপূরক ব্যাখ্যা স্বরূপ। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা কোরআনের কোন শিক্ষাকে বাদ দেয়া যায় না এবং এগুলো কোরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীতও হতে পারে না।

হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহ

হিন্দুধর্মে দু'ধরনের গ্রন্থ রয়েছে। যেমনঃ শ্রুতি এবং স্মৃতি।

শ্রুতি হচ্ছে এমন সব বাণী যেগুলো শ্রুত, অনুধাবিত, অবহিত অথবা নাযিলকৃত। এটা হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। শ্রুতি প্রধানত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক বেদ এবং দুই উপনিষদ। আর এ দু'শ্রেণীকেই স্বর্গীয় হিসেবে মানা হয়।

স্মৃতি, শ্রুতির মত এতটা নয়। যদিও এটা বর্তমানে হিন্দুদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং জনপ্রিয় হিসেবে ধরা হচ্ছে। স্মৃতি হচ্ছে স্মরণ করা বা স্মৃতিপটে অংকন করা। এটি একটি সাহিত্য কর্ম যা অনুধাবন করা সহজ, কারণ এটা জগতের সত্যসমূহকে প্রতীকবাদ এবং পুরাণতত্ত্বের বর্ণনা করে। স্মৃতি স্বর্গীয় হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং এটাকে মানবীয় রচনা হিসেবে ধরা হয়। স্মৃতি ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং সমাজের লোকদের প্রাত্যহিক কার্যাবলি সম্পর্কে নির্দেশনা এবং বিধিবদ্ধ করে দেয়। এগুলো ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পরিচিত। স্মৃতিগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ধরনের লেখার সমন্বয়ে গঠিত যেমন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক এবং ইতিহাস গ্রন্থসমূহ।

হিন্দু ধর্মে কতিপয় ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ অন্যতম।

১. বেদ ঃ (i) 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'vid' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। vid এর অর্থ হচ্ছে 'জানা'। বেদের অর্থ করা হয় চমৎকার জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। বেদে চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছে (যদিও তাদের মতানুযায়ী এ সংখ্যা ১১৩১ এবং এর মধ্য থেকে প্রায় এক ডজনের বেশির কোন হদিস মিলে না। পাঠান জেলীর মহা বৈশ্যের মতে, রিগ বেদ ২১ প্রকারের, অথর্ব বেদ ৯ প্রকারের, ইয়াজুর বেদ ১০১ প্রকারের এবং শ্যাম বেদ ১০০০ প্রকারের)

(ii) রিগ বেদ, ইয়াজুর বেদ এবং শ্যাম বেদ– এসব গ্রন্থগুলোকে অধিকতর প্রাচীন বলে মানা হয় এবং এ তিনটি বেদ একত্রে 'ত্রিবেদ' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' নামে পরিচিত। রিগ বেদকে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বলা হয় এবং এটা তিনটি দীর্ঘ এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে। অথর্ব বেদ হচ্ছে চতুর্থ বেদ এটি সবার শেষে রচিত হয়েছে। রিগ বেদ প্রধানত প্রশংসাসূচক বিভিন্ন গানের সংকলন। ইয়াজুর বেদ ত্যাগের মহিমা সংক্রান্ত নানান সূত্রাবলির সংকলন। শ্যাম বেদ হচ্ছে সুর সঙ্গীতের সংকলন। অথর্ব বেদ হচ্ছে বহু সংখ্যক মন্ত্র সংক্রান্ত সূত্রাবলির সংকলন।

(iii) চার প্রকার বেদ সংকলনের বা রচনার সঠিক তারিখ সম্পর্কে সঠিক ও সর্বসম্মত কোন মতামত পাওয়া যায় না। আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দায়ানন্দ বলেন, বেদগুলো ১৩১০ মিলিয়ন বছর পূর্বে রচিত হয়েছিল। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে, এগুলো ৪০০০ বছরের বেশি পুরাতন নয়।

(iv) একইভাবে এসব গ্রন্থসমূহ কোথায় এবং কার প্রতি নাযিল হয়েছে সে ব্যাপারেও প্রচুর মতভেদ রয়েছে। এ সব মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বেদকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

২. উপনিষদ ঃ 'উপনিষদ' শব্দটি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় 'উপ' যার অর্থ 'নিকট বা কাছে', নি, যার অর্থ 'নিচ বা সামনে' এবং 'ষদ' যার অর্থ 'বসা' থেকে সংকলিত। সুতরাং উপনিষদ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিচে এবং নিকটে বসা'। একদল লোক শিক্ষকের কাছে মতবাদসমূহ শেখার জন্য তাঁর সামনে বসে। শ্যামকারার মতে, উপনিষদ শব্দটি 'ষদ' শব্দমূল থেকে উৎকলিত হয়েছে। যার অর্থ ঢিলা করা, পৌছানো, কিংবা ধ্বংস করা। আর 'উপ' এবং 'নি' এতে প্রত্যয় জাত শব্দ হয়ে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং উপনিষদ এর অর্থ হচ্ছে 'ব্রহ্ম জ্ঞান' যার মাধ্যমে অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা যায়।

হিন্দুধর্মে উপনিষদের সংখ্যা ২০০ এর বেশি। যদিও ভারতের ঐতিহ্যে এ সংখ্যা ১০৮টি বলে বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান উপনিষদের সংখ্যা ১০টি। যাহোক, কেউ কেউ এ সংখ্যাকে ১০-এর অধিক বলে মনে করেন। বাকীদের মতে, এ সংখ্যা ১৮টি।

(ii) বেদান্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে উপনিষদ। যদিও বেদান্ত শব্দটি বর্তমানে উপনিষদ ভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্বের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। শাব্দিকভাবে বেদান্ত অর্থ হচ্ছে বেদের পরিসমাপ্তি বা শেষ। উপনিষদ হচ্ছে বেদের পরিশিষ্ট বা শেষের অংশ এবং কালানুক্রমে এগুলো বৈদিক যুগের শেষে এসেছিল।

(iii) কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বেদ হতে উপনিষদ শ্রেয়তর।

৩. ইতিহাস-মহাকাব্য ঃ রামায়ন এবং মহাভারত নামে হিন্দু ধর্মে দু'টি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে।

(i) রামায়ন এমন একটি মহাকাব্য, যেটি রামের জীবন চরিত নিয়ে আলোচনা করে। বেশির ভাগ হিন্দুই রামায়নের কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞাত।

(ii) মহাভারত হচ্ছে অন্য একটি মহাকাব্য, যেটি দু'জন চাচাত ভাই অর্থাৎ পান্দাবাস এবং কাওরাবাসের মাঝে দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা করেছে। এটিতে-কৃষ্ণের জীবন নিয়েও আলোচনা এসেছে। মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে কমবেশি হিন্দুই জানেন।

৪. ভগ্বদ গীতা ঃ ভগ্বদ গীতা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বজন গ্রাহ্য একটি ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশমাত্র এবং মহাভারতের বিশ্ব পর্বের ২৫-৪২ পর্ব অর্থাৎ ১৮ টি পর্ব দিয়ে ভগ্বদ গীতা রচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে যেসব উপদেশ দিয়েছিল এটি তার বর্ণনা করে।

৫. পুরাণ ঃ যথার্থতা বিচারে পরবর্তী ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে পুরাণ সবচেয়ে বেশি পঠিত ধর্মগ্রন্থ। পুরাণ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'প্রাচীন'। এতে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, আর্য উপজাতির প্রাচীন ইতিহাস এবং হিন্দুধর্মের দেবতাদের জীবন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ বেদের মতই নাযিলকৃত গ্রন্থ। এটা বেদের সমসাময়িক কালে অথবা বেদের কাছাকাছি কোন সময়ে এসেছিল। মহাশ্বেরী বৈশ্য পূরাণকে ১৮টি অংশে ভাগ করেছেন। এসব অংশ বা ভাগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভবৈশ্য পুরাণ। এ অংশকে এ ধরনের নামকরণের কারণ হল, এতে ভবিষ্যতের ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণনা এসেছে। হিন্দুরা ভবৈশ্য পুরাণের কথাকে প্রভুর কথা হিসেবে মানে। মহাশ্বেরী বৈশ্যকে এ বইয়ের নিছক সম্পাদক হিসেবে মনে করা হয়– আর এর প্রকৃত লেখক হলেন স্বয়ং প্রভু।

৬. **অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ ঃ** এছাড়া আরও কিছু হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে যেমন, মনু এবং স্মৃতি ইত্যাদি।

৭. **বেদ ঃ** হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে বেদকে সবচেয়ে খাঁটি বা নির্ভেজাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থই বেদের যথার্থতাকে বাতিল করে দেয় না। হিন্দু পণ্ডিতদের ভাষ্য মতে, বেদের সাথে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, বেদের কথাই প্রনিধানযোগ্য।

এভাবে আমরা ফেরেশতা এবং কিতাবের ধারণা সম্বন্ধে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাই। এই বইয়ের পরের অধ্যায়গুলোতে আমরা নবুয়ত, পরকাল, ভাগ্যলিপি এবং ইবাদতের ব্যাপারে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তা যাচাই করে দেখবো।

এখন, আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে নবুয়ত এবং প্রভুর গুণাবলির ধারণার মধ্যে সমতা যাচাই করে দেখাবো।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে নবুয়াতের ধারণা

ক. ইসলামে রাসূলের ধারণা ঃ আল্লাহর রাসূল এবং নবীরা হচ্ছেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বাণী মানবজাতির সামনে উপস্থাপনের জন্য মনোনীত করেছেন।

প্রতিটি জাতির নিকটই রাসূল প্রেরিত হয়েছিল

ক. আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের সূরায়ে ইউনুসের ৪৭ নং আয়াতে বলেছেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

"প্রতিটি জাতির মাঝেই রাসূল পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর যখন তাদের রাসূল তাদের সামনে আসতেন তখন তাদের মধ্যকার (বিরোধমূলক) বিষয়গুলোকে ন্যায়সঙ্গতভাবে মিমাংসা করে দিতেন। যাতে তাদের প্রতি জুলুম করা না হয়।"

খ. অন্যত্র পবিত্র কোরআনের, সূরায়ে নাহলের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন−

"প্রত্যেক জাতির মাঝে আমি অবশ্যই একজন রাসূল পাঠিয়েছি। (তিনি ঐ জাতিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুত বাতিল তথা শয়তানের ধোকা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা অনেককে কাঙ্খিত হেদায়াত দান করেছেন এবং অনেকের জন্য ভ্রষ্টতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং মিথ্যাবাদীদের পরিণতি (স্বচক্ষে) পর্যবেক্ষণ করো।"

গ. আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ফাতিরের ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন−

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ .

"এমন কোন জাতি ছিল না যাদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়নি।"

ঘ. পবিত্র কোরআনের, সূরায়ে রাদের ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

"আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন।"

কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নবীদের নাম

আদম (আ.), সালেহ (আ.), ইদরীস (আ.), নূহ (আ.), হুদ (আ.), শীষ (আ.), লুত (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.), শুয়াইব (আ.), দাউদ (আ.), সোলায়মান (আ.), ইলিয়াস (আ.), ইলইয়াসা (আ.), মূসা (আ.), আজিজ (উযাইর) (আ.), আইউব (আ.), যুলকিফল (আ.), ইউনুস (আ.), যাকারিয়া (আ.), ইয়াহইয়া (আ.), ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা)।

পবিত্র কোরআনে শুধু কয়েকজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে

ক. পবিত্র কোরআনের ৪র্থ সূরা, সূরায়ে নিসার ১৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন

"কয়েকজন নবীর ঘটনা আমি ইতোপূর্বে আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কয়েকজন নবীর কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।"

খ. পবিত্র কোরআনের ৪০ তম সূরা, সূরায়ে মুমিনের ৭৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন –

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ـ

"আপনার আগে আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের মাঝ থেকে আপনার কাছে অনেকের ঘটনা বর্ণনা করেছি ও অনেকের ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি।"

আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক ১, ২৪, ০০০ নবী পাঠানো হয়েছে

মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৫৭৩৭ নং হাদীসে এবং মাসনাদে আহমদ বিন হাম্বল গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬৫-২৬৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে– "আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক ১, ২৪, ০০০ নবী প্রেরিত হয়েছে।"

পূর্ববর্তী নবীদেরকে শুধুমাত্র স্বগোত্রীয় লোকদের মাঝে পাঠানো হয়েছে

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- এর পূর্বে আগত নবীদের সকলেই তাদের স্বগোত্রীয় এবং স্বজাতির লোকদের জন্যই প্রেরিত হয়েছিল এবং তাঁদের দ্বারা প্রচারিত বাণী শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।

নবী মোহাম্মদ (সা) হলেন সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত রাসূল

পবিত্র কোরআনের ৩৩ তম সূরা, সূরায়ে আহযাবের ৪০নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

"মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্য থেকে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের আগমনের সীলমোহর (সর্বশেষ)। আর আল্লাহ তা'য়ালা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

মোহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন

ক. যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত আল্লাহর রাসূল তাই তিনি শুধুমাত্র মুসলমান কিংবা আরবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হননি। বরং তিনি সমগ্র বিশ্বমানবতার হেদায়াতের ও

মুক্তির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা, সূরায়ে আম্বিয়ার ১০৭নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।"

খ. পবিত্র কোরআনের ৩৪ তম সূরা, সাবা ২৯নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে–

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"

গ. সহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাতের ৫৬তম অধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদীসে বর্ণিত আছে– "আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই তার স্বগোত্রীয় লোকদের মাঝে হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছে কিন্তু আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

হিন্দুধর্মে অবতার এবং রাসূলের ধারণা

১. সাধারণ হিন্দুদের মতানুযায়ী 'অবতার'

ক) সাধারণ হিন্দুদের কাছে অবতারের ধারণাটি নিম্নরূপ। অবতার শব্দটি একটি সংস্কৃত পরিভাষা। এটি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় "অব' অর্থ হচ্ছে 'নিচ' এবং 'তার' অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি উৎসব'। অর্থাৎ অবতার অর্থ হচ্ছে নিচে অবতরণ করা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে অবতারের অর্থ দেয়া আছে– (হিন্দু ধর্মতত্ত্বে) ভূ-পৃষ্ঠে দেবতার আগমন বা পৃথিবীতে আত্মাকে শারীরিকরূপে মুক্তি দান করা। অর্থাৎ, সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার হচ্ছে- সর্বশক্তিমান প্রভুর পৃথিবীতে শারীরিক অবয়বের রূপ ধারণ করে নেমে আসা।

একজন সাধারণ হিন্দু বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান প্রভু শারীরিক রূপ ধারণ করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এবং দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার মানসে বা মানুষের জন্য বিধান জারী করার মানসে পৃথিবীতে আগমন করেন। বেদের কোথাও অবতার সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই। যেমন, শ্রুতি। যাহোক, এটা স্মৃতি তথা পৌরাণিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসের বইতে লেখা আছে।

খ. হিন্দুধর্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সর্বাধিক পঠিত বইতে অবতারের ধারণা পাওয়া যায়ঃ

ক) ভগবদ গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭-৮ ধারায় উল্লেখ আছে–! "হে ভারতবাসী, যখন সত্যের বিলুপ্তি ঘটবে এবং অসত্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে তখন সত্যকে রক্ষা, দুষ্টকে ধ্বংস এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি নিজেকে প্রকাশ করবো। আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।"

খ) পুরাণের ৯ঃ ২৪ঃ ৫৬ তে উল্লেখ আছে– "যখন সত্য বিলুপ্ত পথে এবং পাপাচার বেড়ে যাবে, মহিমান্বিত প্রভু তখন নিজেকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত করেন।"

২. বেদ এবং ইসলামে অবতারের কোন ধারণা নেই বরং রাসূলের ধারণা আছে।

ইসলাম একথা স্বীকার করে না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। বরং ইসলাম স্বীকার করে যে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের মধ্য থেকে একেক যুগে একেকজনকে মনোনীত করেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা হয় যাতে তারা আল্লাহর বাণীকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দিতে পারেন আর এসব ব্যক্তিদেরকে বলা হয় আল্লাহর দূত বা সংবাদবাহক (ইসলামী ভাষায় নবী)।

'অবতার' সম্পর্কে ইতোপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে– তার অর্থ হচ্ছে নিচে নেমে আসা বা অবতরণ করা। কতিপয় পণ্ডিতরা বর্ণনা করেছেন যে, 'প্রভুর অবতরণ' নির্দেশ করে যে, প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষের আবির্ভাব যাঁর সাথে প্রভুর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। চার প্রকার বেদের কয়েক জায়গায়ই প্রভুর সাথে মানুষের এ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এভাবে যদি আমরা হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সাথে ভগবদ গীতা এবং পূরাণের বক্তব্যকে মিল করে দেখতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা ভগবদ গীতা এবং পূরাণের সাথে ঐ বক্তব্যের সাথে একমত হবো যাতে 'অবতার' বলতে প্রভু কর্তৃক মানুষের মনোনয়নকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের মানুষকেই ইসলাম নবী হিসেবে আখ্যা দেয়।

প্রভুর গুণাবলি

প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত

ক. মানুষকে বোঝানোর জন্য প্রভুর মানবীয় রূপ ধারণ করতে হয় না

এক সময় কতকগুলো অ-সেমিটীয় ধর্ম ছিল। যেগুলো ধর্মও প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপ সম্পর্কিত দর্শনের বিশ্বাসী ছিল। যেমন, প্রভুর মানবীয় রূপ ধরার ধারণা। যারা এতে বিশ্বাসী তাদের সাধারণ যুক্তি হচ্ছে। যে, সর্বশক্তিমান প্রভু এতই নির্ভেজাল এবং পবিত্র যে, মানুষের কঠোরতা, ব্যর্থতা, দুর্বলতা, অনুভূতি, আবেগ এবং লোভ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞাত নন। তিনি জানেন না কিভাবে একজন লোক আহত কিংবা সমস্যায় পড়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে। সুতরাং মানুষের আচরণ বা ব্যবহারকে শাসন করার জন্য প্রভু পৃথিবীতে মানুষের রূপ ধরে নেমে আসেন। এ যুক্তির কারণে এটাকে খুবই যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা যাচাই করা উচিত।

খ. সৃষ্টিকর্তা একটি নির্দেশনামূলক পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন

মনে করুন, আমি একটি টেপ রেকর্ডার উৎপাদন করি। এখন কোন্ রেকর্ডারটি ভালো বা কোন্টি মন্দ তা জানার জন্য কী আমি নিজেই টেপ রেকর্ডার হতে হবে? সাধারণ ব্যবহার বা ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারের কী কী অসুবিধা হচ্ছে তা জানার জন্য উৎপাদকের কখনই নিজেকে একটি টেপ রেকর্ডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সুতরাং উৎপাদনকারী হিসেবে ব্যবহারকারীর জন্য আমি একটি নির্দেশিকা পুস্তিকা লিখে দিব। এ নির্দেশিকায় আমি বলে দেব যে, "একটি অডিও ক্যাসেট শোনার জন্য, একটি ক্যাসেট প্রবেশ করান এবং 'প্লে' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিন। আবার বন্ধ করতে, 'স্টপ' চিহ্নিত বোতামে চাপ দিন। যদি আপনি দ্রুত সামনে যেতে চান তাহলে 'ফাস্ট ফরওয়াড' বোতামে চাপ দিন। রেকর্ডারটি অতি উষ্ণ জায়গায় রাখবে না তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটাকে পানিতে ডোবাবেন না তাহলেও এটি অকেজো হয়ে যাবে।" উৎপাদনকারী একটি নির্দেশনা পুস্তিকা অথবা ব্যবহারকারীর পুস্তিকা লিখবেন যেটিতে ঐ যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য করণীয় বা বর্জনীয় লেখা থাকবে।

গ. মহিমান্বিত কোরআন মানুষের জন্য নির্দেশনা পুস্তিকা

একইভাবে আমাদের মহান প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা জানার জন্য মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন পড়ে না। তিনিই সেই মহান সত্ত্বা,

যিনি এ বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। তাঁর শুধুমাত্র কর্তব্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে নির্দেশিকা পুস্তিকা নাযিল করা। এ ধরনের পুস্তিকা সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবেঃ

(ক) মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (খ) তাদের সৃষ্টিকর্তার পরিচয় (গ) চিরন্তন সফলতা প্রাপ্তির জন্য তাদের কী করা উচিত এবং কী ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত? আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা হচ্ছে মহিমান্বিত কোরআন।

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলদেরকে মনোনীত করেন

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিকা পুস্তিকা লেখার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ধরায় অবতরণের প্রয়োজন হয় না। তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষকে মনোনীত করেন এবং তার সাথে কিতাবের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ধরনের মনোনীত লোকদেরকে নবী বা সংস্কারক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। প্রভু এ ধরনের লোকদের কাছে তার মতামত কিতাবের সাহায্যে জানিয়ে দেন।

প্রভু কখনো মানুষের রূপ ধরেনি এবং কখনো ধরবেন না

কিছু লোক বলে যে, যদি প্রভু সবকিছু করতে পারেন তবে তিনি কেন মানুষের রূপ ধরতে পারবেন না? কারণ প্রভু যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, মানুষের গুণাবলি এবং প্রভুর গুণাবলি সম্পূর্ণ আলাদা।

১. প্রভু অমর; মানুষ মরণশীল

প্রভু অমর; মানুষ হচ্ছে মরণশীল। মানুষ 'প্রভুমানব' হতে পারেন না। উদাহরণ মতে, কোন লোক অমর এবং মরণশীল একই সময়ে এই দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না। এটা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। প্রভুর কোন শুরু বা শেষ নেই। কিন্তু মানব জীবনের শুরু আছে। আপনি এমন হতে পারেন না যার শুরু নেই এবং একই সময়ে যার শুরু আছে। আবার মানব জীবনের শেষ আছে। আপনি একই সময়ে এমন দুটি গুণের অধিকারী হতে পারেন না যাদের মধ্য থেকে একজনের শেষ নেই এবং অন্যজনের শেষ আছে। এটা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

২. প্রভুর পানাহারের প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান প্রভুর পানাহার প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাওয়ার প্রয়োজন হয়। মহিমান্বিত কোরআনের সূরায়ে আনামের ১৪নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে– وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ـ

"আর তিনি সেই মহান সত্ত্বা যিনি খাওয়ান কিন্তু তাঁকে খেতে হয় না।"

৩. প্রভুর বিশ্রাম এবং ঘুমের প্রয়োজন হয় না

প্রভুর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি কখনো ক্লান্ত হন না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। প্রভুর ঘুমের প্রয়োজন হয় না।

আল্লাহ বলেন–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ ـ

"আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব। তন্দ্রা কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং ঘুমও। ভু-মণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর জ্ঞাত।"

খ. অন্য মানুষের উপাসনা করা একটি পাপের কাজ ঃ

যদি প্রভু মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তার প্রভু হওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং একজন মানুষের উপাসনা করার মাঝে কোন উপকার নেই। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, আমি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান শিক্ষকের ছাত্র এবং আমি নিয়মিতভাবে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলি এবং পড়াশুনায় তার সহযোগিতা নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার শিক্ষক দুর্ঘটনায় পড়লেন এবং তাঁর স্মৃতি লোপ পেল। অর্থাৎ, তাঁর স্মৃতি এমনভাবে হারিয়ে গেল যা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এখন পড়াশুনার ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষকের সহযোগিতা চাওয়া আমার জন্য বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কারণ, ঐ শিক্ষক দুর্ঘটনায় পড়ার পর যখন তার স্মৃতিলোপ পেয়েছে তখন তিনি আর পড়াশুনার নির্দেশনা দানে বিশেষজ্ঞ নন। একইভাবে, কীভাবে একজন মানুষ এমন একজন প্রভুর উপাসনা করতে পারে এবং তাঁর নিকট স্বর্গ প্রার্থনা করতে পারে যে তাঁর স্বর্গীয় যোগ্যতা হারিয়ে নিজেকে আপনার এবং আমার মত সাধারণ মানুষে রূপান্তরিত করেছে? যদি একজন মানুষ একজন মানুষের উপাসনা করে তাহলে কেন অন্যান্য লোকেরা আপনার এবং আপনার পাশে অন্যান্য লোকের উপাসনা করতে পারবে না?

গ. মানুষ প্রভু হতে পারে না

সুতরাং অস্তিত্বশীল কোন জীব একই সময় প্রভু এবং মানুষ উভয় হতে পারে না। যদি প্রভু তাঁর ঐশ্বরীয় শক্তি প্রদর্শন করেন তাহলে তিনি কখনোই মানুষ হতে পারেন না। কারণ, মানুষের ঐশ্বরীয় শক্তি থাকে না। আবার যদি প্রভু মরণশীল হন যেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের গুণ, তাহলে তিনি আর প্রভু থাকেন না। কারণ, প্রভু হলেন অমর। এছাড়া একই মানুষ প্রভু হতে পারে না কারণ, মানুষের পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। যদি এরূপ হওয়া সম্ভবই হয়-তাহলে আপনি এবং আমিও প্রভু হতে পারতাম এবং ঐশ্বরীয় শক্তির অধিকারী হতাম। এ কারণেই প্রভু কখনও মানুষের রূপ ধারণ করবেন না অথবা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন না। পবিত্র কোরআন প্রভুর মানুষের রূপ ধারণ করা সম্পর্কিত ধারণার বিপরীতে অবস্থান নেয়। প্রভুর মানুষের রূপ ধারণা করা সম্পর্কিত ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক ধারণা।

ঘ. প্রভু অপ্রভুচিত কোন কাজ করবেন না

ইসলাম এ কথা বলে না যে, প্রভু যে কোন ধরনের কাজ করতে পারেন। বরং ইসলাম একথা বলে যে, প্রভুর সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বুঝতে চাই যে, প্রভু সাধারণ সব কাজ করতে পারেন কারণ তিনি স্বর্গীয় গুণাবলির অধিকারী।

(i) প্রভু কখনো মিথ্যা কথা বলেন না

প্রভু শুধুমাত্র প্রভুচিত কাজই করেন। তিনি অপ্রভুচিত কোন কাজ করেন না। প্রভু মিথ্যা বলতে পারেন না। এমনকি মিথ্যা বলা বা মিথ্যা বিবৃতি দেয়ার কোন ইচ্ছাও প্রভু কখনো করতে পারেন না। প্রভু কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না কারণ, মিথ্যা বলা অপ্রভুচিত কাজ। প্রভু যে মুহূর্তে মিথ্যা কথা বলেন, তখন তাঁর প্রভুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

(ii) প্রভু কোন অবিচার করবেন না।

প্রভু অবিচার করতে পারেন না কিংবা কোন অন্যায় কাজ বা অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন ইচ্ছাও করতে পারেন না তিনি। তিনি এমন কাজ করবেন না এবং এমন কাজ তিনি করতে পারেন না কারণ অন্যায়কারী বা অবিচারকারী হওয়া অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কোরআন ৪র্থ সূরা, নিসার ৪০ নং আয়াতে বলেছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

"আল্লাহ তায়ালা কখনোই সামান্যতম পরিমাণও অবিচার করতে পারেন না।"

যে মুহূর্তে প্রভু অন্যায় কাজ করেন সে মুহূর্তে তাঁর প্রভুত্ব বাতিল হয়ে যায়। অনুগ্রহ করে চিন্তা করুন যে, প্রভু একই সময়ে প্রভু হয়ে এবং অপ্রভুচিত কাজ করতে পারেন না। তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঐশ্বরীয় গুণাবলির এবং অমর আর তাঁর সৃষ্টির এসব গুণাবলির অধকারী তিনি হতে পারেন না বা হতে পারেন এটা কীভাবে সম্ভব?

(iii) প্রভু ভুল করতে পারবেন না

পরিপূর্ণতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর কোন সৃষ্টি কখনো এ গুণের অধিকারী হতে পারে না। আমরা শুধু ধারাবাহিকভাবে উন্নতির চেষ্টা করতে পারি কিন্তু কখনোই পরিপূর্ণতা পেতে পারি না।

সুতরাং প্রভু কী কখনও ভুল করতে পারেন? তিনি কখনো ভুল করতে পারবেন না। ভুল করা মানুষের স্বভাব। ভুল করা অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কোরআন ২০তম সূরা, সূরায়ে ত্বাহার ৫২ নং আয়াতে বলেছে–

...لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى "--- আমার প্রভু কখনো ভুল করেন না।"

চিন্তা করে দেখুন যে, প্রভু যদি ভুল করার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহলে প্রভু যখন ভুল করতেন তখনই তিনি আর প্রভু থাকতে পারতেন না।

(iv) প্রভু ভুলে যাবেন না।

প্রভু ভুলে যাবেন না কারণ ভুলে যাওয়া প্রভুর সত্ত্বার মধ্যে অপ্রভুচিত কাজ। পবিত্র কুরআনের ২০তম সূরা, সূরায়ে ত্বহার ৫২নং আয়াতে বলেছেন– ... لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

"আমার প্রভু কখনো ভুল করেন না এবং কিছুই ভুলে যান না।"

যে মুহূর্তে প্রভু কোন কিছু ভুলে যান তখন তিনি আর প্রভু থাকেন না।

ঙ. প্রভু শুধু প্রভুচিত কাজই করেন ঃ

(i) সকল কিছুর ওপরই আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে

পবিত্র কোরআন অনেক জায়গায় বলেছে যে প্রভু সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যেমন, ২য় সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।"

এই একই বর্ণনা আমাদের বোধোদয়ের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে–

সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াত, সূরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াত, সূরা আল ইমরান ২৯ নং আয়াত, সূরা নাহল ৭৭ নং আয়াত, সূরা ফাতির ১ নং আয়াত

(ii) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন

মহিমান্বিত কোরআন এর ৮৫তম সূরা সূরাতুল বুরুজের ১৬ নং আয়াতে বলেছে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ অর্থাৎ, "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন।"

এখন, আমি নিশ্চিত যে, আপনি নিজে একথা বিনয় এবং বিশ্বস্ততার সাথে মেনে নেবেন যে, প্রভু কেবল মাত্র প্রভুচিত ব্যাপারই ইচ্ছা পোষণ করেন, অপ্রভুচিত ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন না। মানুষের জন্য আরোপীয় গুণাবলি যেমন–, ভুলে যাওয়া, ভুল করা, দুর্বলতা অনুভব করা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, ঈর্ষা করা ইত্যাদি গুণ আল্লাহর জন্য আরোপ করার মাধ্যমে কেউ শুধু তার প্রভুকে নিয়ে উপহাস এবং ঠাট্টায় মেতে ওঠল। আপনি কী চিন্তা করতে পারেন আমরা মানুষেরা মানুষের এসব গুণকে প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করে তাঁর প্রতি ন্যায় বিচার করছি? তাই এটা কী সত্যি নয় যে, আমাদের প্রভু এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি যা অজ্ঞ মানুষরা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে চিরতরে মুক্ত? এজন্য মহিমান্বিত কোরআন এর ৫৯ তম সূরা, সূরায়ে হাশরের ২৩নং আয়াতে বলেছে– سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

"হে নবী (সা) আপনি বলুন, মুশরিকরা যে বিষয় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।"

এভাবে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবুয়াতের ধারণা এবং প্রভুর গুণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মিল খুঁজে পাই। এ বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পরকাল, অদৃষ্ট এবং ইবাদতের ধারণা সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য বিদ্যমান তা আলোচনা করব।

এখন, আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে যেসব বর্ণনা রয়েছে তার আলোচনা করব।

মুহাম্মদ (সা) হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহেই নবী হিসেবে স্বীকৃত

ক. ভভৈশ্য পুরাণে মুহাম্মদ (সা)- কে নবী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

ভভৈশ্য পুরাণের প্রাতী স্বরাগ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩ এর ৫-৮ শ্লোকে বলা হয়েছে– "একজন ভিনদেশী, যিনি ভিনদেশী ভাষায় কথা বলবেন, এবং একজন আধ্যাত্মিক গুরু তার সঙ্গীদের নিয়ে আবির্ভূত হবেন। তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। রাজা এই ঐশ্বরিক স্বভাবের ব্যক্তিত্বকে 'পঞ্চগডা' এবং গঙ্গার জলে গোসল করানোর (সকল পঙ্কিলতা হতে তাকে পবিত্র করণের) পর তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শনের পর এ প্রস্তাব দিবেন যে, "আমি আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছি। আর আপনি হলেন মানবজাতির জন্য গৌরব ও কল্যাণের বিষয়; আরবের অধিবাসী। আপনি শয়তানকে হত্যা করার জন্য একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন।" এ ধারাটি পরিষ্কারভাবে বলছে যে–

(i) নবীর নাম হবে মুহাম্মদ।

(ii) তিনি হবেন আরবের অধিবাসী, সংস্কৃত শব্দ 'মরুস্থল' অর্থ হচ্ছে বালুময় জায়গা মরুভূমি।

(iii) নবীর সঙ্গী অর্থাৎ সাহাবাদের বিশেষ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা) ছাড়া অন্য কোন নবীর এত বেশি সংখ্যক সাহাবী ছিল না।

(iv) তাঁকে বিশ্বমানবতার জন্য গৌরবের বিষয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহিমান্বিত কোরআনের ৬৮তম সূরা, সূরায়ে কলামের ৪নং আয়াতে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে– وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

অর্থাৎ, "আর নিশ্চয়ই আপনি উন্নততম চরিত্রের অধিকারী।"

এবং ৩৩ তম সূরা, সূরায়ে আহযাবের ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য তোমাদের রাসূল (সা)- এর জীবনেই সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।"

(v) তিনি অশুভ আত্মাকে হত্যা করবেন। অর্থাৎ, তিনি সব রকম পাপাচার এবং শয়তানী উপাসনাকে ধ্বংস করবেন।

(vi) তিনি তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

পবিত্রতা লাভ করবে। ধর্মহীন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা 'মুসলমান' হিসেবে পরিচিত হবে। আমি গোশত খাওয়া জাতির ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।"

এখন পরকাল এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস নিয়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে যে ধারণা রয়েছে তা যাচাই-বাছাই, গবেষণা এবং উপস্থাপন করবো।

মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ধারণা

১. হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা– আত্মার স্থানান্তর

অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যুর এবং পুনর্জন্মের চক্রে বিশ্বাস করে, যাকে 'সমসার' বলে।

একে আত্মার স্থানান্তরবাদও বলা হয়। এ মতবাদকে হিন্দুধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে মানা হয়। পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব মতে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে পার্থক্য এমনকি জন্মের সময়ও যে পার্থক্য দেখা দেয় এর কারণ হচ্ছে তাদের অতীত কর্ম অর্থাৎ, পুর্বজন্মে তারা যে কাজ করেছিল তার প্রভাব। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শিশু স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্মে অথচ অন্য একটি শিশু প্রতিবন্ধী কিংবা অন্ধ হয়ে জন্ম নেয়, এ পার্থক্য তাদের পূর্বের জন্মের কর্মের জন্যই হয়ে থাকে। যারাই এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, যেহেতু এ জীবনে সকল কাজের ফলাফল প্রতিফলিত হতে পারে না তাই তাদের কর্মের সকল ফলাফল পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে অন্য জীবনের আবশ্যক।

(ক) ভগবদ গীতার ২ঃ২২ ধারায় বলা হয়েছে–

"মানুষ যেমনি নতুন পোশাক পরিধান করে এবং পুরাতন পোশাক পরিত্যাগ করে, আত্মাও তেমনি নতুন দেহ গ্রহণ করে এবং পুরাতন দেহ ত্যাগ করে।"

খ) পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব বৃহদারানিকা উপনিষদের ৪ঃ ৪ঃ ৩ ধারায়ও বর্ণিত হয়েছে "একটি শুয়া পোকা যা ধীরগতিতে তৃণভূমির কোন পত্রের শীর্ষভাগ দিয়ে অতিক্রম করায় এতে একটি নতুন তৃণপত্র সৃষ্টি হয় তেমনি আত্মা কোন দেহ থেকে সরিয়ে রাখলে তা নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করে।"

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, রাজা ভোজ একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের ৫০০ বছর পরে নবুয়াতের এ ধারণা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ছিলেন রাজা শ্যালিভ্যানের অধস্তন ১০ম বংশীয়। এসব লোকেরা একথাটা উপলব্ধি করতে ভুলে গেছে যে, ভোজ নামে শুধুমাত্র একজন রাজা ছিলেন না। যেমনিভাবে মিশরীয় সকল রাজাকে বলা হত 'ফারাও' এবং রোমানদের সকল রাজাকে বলা হত 'সিজার'।

তেমনিভাবে ভারতের রাজাদের বলা হত 'ভোজ'। এ ধরনের 'ভোজ' রাজাদের সংখ্যা ছিল অনেক যারা একাদশ শতাব্দীর বহু পূর্বে রাজা ছিলেন।

মহানবী (সা)-শারীরিকভাবে 'পঞ্চগভা' এবং গঙ্গার জলে গোসল করেননি। যেহেতু গঙ্গানদীর পানিকে পবিত্র মনে করা হয়, তাই গঙ্গা জলে গোসল করা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এর অর্থ হচ্ছে যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা লাভ। এখানে নবুয়াতের ধারনায় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) 'মাছুম' বা নিষ্পাপ ছিলেন।

খ. ভবৈশ্য পুরাণে মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতের স্বীকৃতি প্রদান ভবৈষ্য পুরাণের প্রাতীস্বরাজ পর্ব III, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ১০-২৭ মহাঋষি ব্যাস নবুয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

ভিনদেশী লোকটি যাঁর ভাষাও হবে ভিনদেশী সুপরিচিত আরবভূমিকে কলুষিত করবে। দেশে আর্য ধর্মকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতোমধ্যে সেখানে একজন ভ্রষ্ট শয়তান আবির্ভূত হবে যাকে আমি হত্যা করেছিলাম। সে এখন আবার শক্তিশালী শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হবে। এসব শত্রুকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য এবং তাদের পথনির্দেশনা দেয়ার জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ, যিনি আমা কর্তৃক প্রেরিত, ব্রহ্মের বিশেষ দূত, দুষ্টলোকদের সঠিক পথে ফিরানোর জন্য সদা ব্যস্ত থাকবেন। হে রাজা! তোমাকে বোকা বর্বরদের দেশে যাওয়ার দরকার হবে না, বরং তুমি যেখানে আছ সেখানে থেকেই আমার দয়ার দ্বারা পবিত্র হবে। রাত্রে ঐশ্বরিক মেজাজে ধূর্ত লোকটি-পিশাচের ছদ্মবেশ রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজা তোমার আর্য ধর্মকে সকল ধর্মের উপরে স্থান দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার নির্দেশনা অনুযায়ী, আমি গোশত খাওয়াদের শক্তিশালী ধর্মীয় মতবাদ কার্যকর করেছি। আমার অনুসারীরা খাৎনাবিশিষ্ট মানুষ হবে, তাদের মাথায় কোন লেজ থাকবে না, তারা দাঁড়ি রাখবে, আযানের ধ্বনির মাধ্যমে তারা বিপ্লবের ঘোষণা দিবে এবং সকল বৈধ জিনিস খাবে। তারা শুকর ছাড়া সকল প্রকার জন্তুর গোশত খাবে। তারা পবিত্র গুল্মোদ্যানের পানি দ্বারা পবিত্র হবে না কিন্তু যুদ্ধাবস্থায়।

২. কর্ম-কারণ ও ফলাফলের বিধি ঃ কর্ম মানে কাজ। এর দ্বারা শুধুমাত্র দেহ কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজকে বুঝায় না বরং মন কর্তৃক কোন কাজের পরিকল্পনাকেও বোঝায়। কর্ম হচ্ছে প্রকৃত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া কিংবা কারণ এবং ফলাফলের বিধি। " যেমন কর্ম তেমন ফল"– প্রবাদ এর মাধ্যমে এটাকে ব্যাখ্যা করা যায়। একজন কৃষক কোন ক্ষেতে গম বুনে ধানের আশা করতে পারে না। একইভাবে, প্রতিটি ভাল চিন্তার কাজ কিংবা বিষয় অন্য একটি সমান প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। আর প্রতিটি নির্দয় চিন্তা, কর্কশ কথা এবং খারাপ কাজ আমাদের এ জীবন কিংবা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

৩. ধর্ম-সঠিক কর্তব্যসমূহ পালন ঃ ধর্ম অর্থ হচ্ছে সত্য এবং সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন। এটা হতে পারে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শ্রেণীভিত্তিক। বিশ্বময় সত্য এবং সঠিক দায়িত্বসমূহ পালন করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ভাল কাজ করার জন্য, ধর্ম অনুসারে জীবন পরিচালনা করা উচিত– অন্যথায় মন্দ কাজ সম্পাদিত হয়। ধর্ম ইহকাল এবং পরকাল উভয়কেই প্রভাবিত করে।

৪. মোকসা -পুনর্জন্মবাদ চক্র হতে মুক্তিলাভ ঃ মোকসা এর অর্থ হচ্ছে 'সামসার' বা পুনর্জন্মবাদ চক্র হতে মুক্তি লাভ। প্রত্যেক হিন্দুর চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে যে, পুনর্জন্মবাদ চক্র একদিন শেষ হবে এবং তার আর নতুন করে

জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এটা তখনই হবে যখন পুনর্জন্ম হওয়ার জন্য ব্যক্তির কোন কর্ম অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তার ভাল এবং মন্দ কাজের কিছু বাকী থাকবে না।

৫. বেদে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের কথা উল্লেখ নেই ঃ সবচেয়ে লক্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে নির্ভেজাল ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ বেদে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় নি, উপস্থাপনও করে নি, এমনকি এর কথা উল্লেখও করা হয় নি। বেদে আত্মার স্থানান্তর তত্ত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ও উল্লেখ নেই।

৬. 'পুনর্জন্ম' দ্বারা পুনর্জন্মবাদের চক্রকে বোঝায় না বরং এর দ্বারা মৃত্যুর পরের জীবনকে বোঝায়

পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের জন্য সাধারণত, যে শব্দটিকে বুঝায় তা হচ্ছে 'পুনর্জন্ম'। সংস্কৃত ভাষায়, 'পুণার' অর্থ হচ্ছে 'পরবর্তী কাল' বা 'পুনরায়'। আর 'জন্ম' অর্থ হচ্ছে জীবন। সুতরাং 'পুনর্জন্ম' বা 'পুনা' অর্থ দাঁড়ায় পরবর্তী জীবন বা পরকালের জীবন। এর মাধ্যমে মৃত্যুর পর পৃথিবীতে জীবন্ত করে সৃষ্টির মত বার বার ফিরে আসাকে বোঝায় না।

যদি কেউ বেদ ভিন্ন অন্যান্য হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কিত ধারাগুলো পড়ে এবং মনে মনে মৃত্যুর পরের জীবনকে কল্পনা করে তাহলে সে মৃত্যুর পরের জীবনের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারবে কিন্তু বার বার পুনর্জন্মের কথা কোথাও তালাশ করে পাবে না। ভগবদ গীতা ও উপনিষদে পুনর্জন্ম সম্পর্কে যেসব বিবৃতি রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য। পুনর্জন্ম চক্র বা বার বার জন্ম সম্পর্কিত ধারণাটি বৈদিক যুগের পরে এসেছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন, উপনিষদ, ভগবদ গীতা এবং পুরাণে পুনর্জন্মের ধারণাটি মানুষ সংযোজন করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তিতে ব্যক্তিকে জন্মগত যে পার্থক্য, বিভিন্ন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপটে যাতে লোকেরা তাদের মধ্যে এ ধারণা পায় যে, 'সর্বশক্তিমান প্রভু মিথ্যা নয়'– এসব ব্যাপারকে যৌক্তিক এবং ব্যাখ্যা করার জন্যই পুনর্জন্ম ধারণাটির উৎপত্তি ঘটেছে। সুতরাং প্রভু যেহেতু মিথ্যা সেহেতু মানুষের মাঝে যেসব পার্থক্য এবং অসমতা দেখা দেয় তা শুধুমাত্র তাদের অতীত জীবনের কর্মফলের জন্যই হয়। এ যুক্তির ব্যাপারে ইসলামের অত্যন্ত যৌক্তিক জবাব রয়েছে– যা পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব, ইনশাল্লাহ।

৭. বেদে মৃত্যু পরের জীবন ঃ বেদে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এগুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক. রিগ বেদের ১০ নং বইয়ের স্তুতিস্তাবক -১৬, ধারা -৪ এ বর্ণিত আছে। "অজাত অংশ, অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তাদের গৌরবকে আগুণের শিখায় জ্বলতে দাও, এর (জ্বালা) ভোগ কর, ঐসব সম্মানিত সদস্যদের সাথে যারা তোমাদের মধ্যে জাতভেদে সৃষ্টি করেছে, ধার্মিকদের সাথে ঐ জগতে নিয়ে চলো।'

সংস্কৃত শব্দ 'Sukritamu Lakam' অর্থ হচ্ছে ধার্মিকদের কথা বা ধার্মিকদের অঞ্চল, এর দ্বারা পরকালকে বোঝানো হয়েছে।

খ. রিগ বেদের বই-১০, স্তুতিস্তাবক-১৩, ধারা-৫ বলা হয়েছে –

"..... আকাশ সম্পর্কীয় জীবন, অবশিষ্ট অংশ (দেহের মত) বিদায় নেয়, তাতে জাতভেদ দেহের সাথে মিশে যায়।"

এ ধারাটিতেও দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনকে বোঝানো হয়েছে।

৮. প্যারাডাইস -বেদে স্বর্গ ঃ বেদের বেশ কয়েকটি জায়গায় স্বর্গের বর্ণনা পাওয়া যায় ; যেমন,

ক) অর্থব বেদের বই-৪, স্তুতিস্তাবক-৩৪ ধারা -৬ এ (দেবীবান্দ) বলা হয়েছে– "ননীর এসব ধারা, তাদের মধুর তীরে, ফোটায় ফোটায় ঝরা পনির দুধ মাখনের সাথে এবং পানি তোমার গৃহ জীবনে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি পূর্ণভাবে এসব বস্তুগ্রহণ করার মাধ্যমে রূপান্তরিত রূহকে শক্তিশালী করতে পার।"

ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন

১. জীবন শুধুমাত্র একটিই অতঃপর পরকালে আবার জীবন পাওয়া যাবে

পবিত্র কোরআনে সূরায়ে বাক্বারার ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔

"তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। পরিশেষে তোমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

ইসলাম বলে যে, একজন মানুষ পৃথিবীতে আসে মাত্র একবারই এবং পরে সে মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন সে আবার জীবন ফিরে পাবে। তখন সে তার কাজের ওপর ভিত্তি করে হয়তো জান্নাতে যাবে নয়তো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. জীবন হচ্ছে পরকালের জন্য পরীক্ষা ঃ

পবিত্র কোরআনের ৬৭ নং সূরা মুলকের ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۔

"তিনি সেই মহান সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই যে তোমাদের মাঝে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'

এ জীবনে আমরা যে সময় পার করি তা পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা মাত্র। যদি আমরা এ জীবনে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশগুলো মেনে চলি এবং তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, তাহলে আমরা জান্নাতে অর্থাৎ চিরশান্তির আবাসে প্রবেশ করতে পারবো। আর যদি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার নির্দেশগুলো অনুসরণ না করি এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হই তাহলে আমরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হব।

৩. শেষ বিচার দিনে পরিপূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে

পবিত্র কোরআনের তৃতীয় সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

"প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল! আর শেষ বিচারের দিনে তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবে। পৃথিবীর এ জীবন সামান্য প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।"

৪. বেহেশত –জান্নাত ঃ ক. জান্নাত অর্থাৎ বেহেশত হচ্ছে একটি চিরস্থায়ী সুখের আবাসন। আরবিতে 'জান্নাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'বাগান। পবিত্র কোরআনে অত্যন্ত বিশদভাবে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বাগানের তলদেশ দিয়ে পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। এসব নহর হচ্ছে একেবারে খাঁটি দুধের নহর এবং পবিত্র ও বিশুদ্ধ মধুর। বেহেশতে সব ধরনের ফল থাকবে। সেখানে কোন ধরনের অশান্তির চিহ্ন মাত্র থাকবে না এবং কোন ধরনের মন্দ কথা-বার্তা বা আলোচনাও সেখানে উচ্চারিত হবে না। সেখানে কোন ধরনের পাপ, কঠোরতা, দুশ্চিন্তা, সমস্যা বা দারিদ্রতার স্থান পাবে না। এভাবে জান্নাতে থাকবে শুধুই সুখ আর সুখ।

খ. কোরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে জান্নাতের বিবরণ রয়েছে ঃ

(১) সূরা আলে ইমরানের আয়াতে নং ১৫ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

"...., যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর দরবারে জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহমান। যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে রয়েছে সতী-সাধ্বী নারীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব কিছু জানেন।"

(২) সূরা আলে ইমারনের ১৯৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে -

اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ـ

"যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"

(৩) সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে সতী-সাধ্বী রমনীগণ। আর আমি তাদেরকে সুদীর্ঘ ছায়ায় প্রবেশ করাব।"

(৪) ৫ম সূরা সূরাতুল মায়িদার ১১৯নং আয়াতে বলা হয়েছে –

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

"তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। সেখানে তারা সারাজীবন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই সর্বোত্তম সফলতা।"

(৫) সূরায়ে তওবার ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন –

"আল্লাহ তার মুমিন পুরুষ এবং নারীদের প্রতি এমন জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহমান। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। তিনিও চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদেরকে উত্তম বাসস্থান দিবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সফলতা।"

এছাড়াও পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতেও জান্নাতের বিবরণ রয়েছে ঃ

(৬) ১৫ তম সূরা, সূরাতুল হিজরের ৪৫-৪৮ নং আয়াত

(৭) ১৮ তম সূরা ক্বাফ -এর এর ৩১ নং আয়াত

(৮) ২২ তম সূরা সূরায়ে হাজ্জের ২৩ নং আয়াত

(৯) ৩৫ তম সূরা সূরায়ে ফাতিরের ৩৩-৩৫ নং আয়াত

(১০) ৩৬ তম সূরা সূরায়ে ইয়াসীনের ৫৫-৫৮ নং আয়াত

(১১) ৩৭ তম সূরা সূরায়ে আস্সাফফাতের ৪১-৪৯ নং আয়াত

(১২) ৪৩ তম সূরা সূরায়ে যুখরুফের ৬৮-৭৩ নং আয়াত

(১৩) ৪৪ তম সূরা সূরায়ে দুখানের ৫১-৫৭ নং আয়াত

(১৪) ৫২ তম সূরা সূরায়ে মুহাম্মদের ১৫ নং আয়াত

(১৫) ৫৫ তম সূরা সূরায়ে আর রহমানের ৪৬-৭৭ নং আয়াত

(১৬) ৫৬ তম সূরা সূরায়ে ওয়াকিয়ার ১১-৩৮ নং আয়াত

৫. নরক-জাহান্নাম ঃ জাহান্নাম বা নরক হচ্ছে অতীব যন্ত্রণার স্থান, যেখানে পাপীরা ভীষণ যন্ত্রনায় পতিত হবে এবং নরকাগ্নিতে জ্বলে সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করবে। একশ্রেণীর মানুষ এবং পাথর হবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী। এছাড়া কোরআণে বর্ণনা করেছে যে, যতবার তাদের শরীরের চামড়া পুড়ে যাবে ততবারই নতুন চামড়া গজিয়ে দেয়া হবে যাতে তারা যন্ত্রনা ভোগ করতে পারে। পবিত্র কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের বিবরণ দিয়েছেন –

(১) ২য় সূরা সূরায়ে বাক্বারার ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

"আর তোমরা ঐ (জাহান্নামের) অগ্নিকে ভয় কর যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর। বস্তুতঃ তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিদের জন্যই।"

(২) ৪র্থ সূরা সূরায়ে নিসায় ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াত অস্বীকার করবে আমি (জাহান্নামের) অগ্নিতে নিক্ষেপ করব। যখন-তাদের চামড়া পুড়ে ঝলসে যাবে তখন তাতে (নতুন) চামড়া পরিবর্তন করে দেয়া হবে যাতে তারা আযাবের স্বাদ ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং মহাবিজ্ঞ।"

(৩) ১৪ তম সূরা সূরা ইবরাহীমের ১৬-১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

"তার জন্য নির্ধারিত জাহান্নাম আর তাকে উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে। তা তাকে টেনে নিবে, কোন কিছুই তাকে বাঁচাবে না এবং চতুর্দিক থেকেই যেন মৃত্যু ধেয়ে আসবে অথচ সে মরবে না। সেখানে তার জন্য রয়েছে কঠোর আযাব।"

(৪) ২২তম সূরা সূরায় হাজ্জের ১৯-২২ আয়াতে বলা হয়েছে –

"অতঃপর কাফিরদের জন্য জাহান্নামের অগ্নিশিখা নির্ধারিত। তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। তাদের পেটের যাবতীয় সবকিছু তা বের হয়ে যাবে আর তাদের চামড়াও খসে পড়বে। তাদের জন্য রয়েছে লোহার দন্ড। যখন তারা তার নিকষ অন্ধকার হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে পুনরায় অগ্নিতে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং (বলা হবে) উত্তপ্ত শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।"

(৫) ৩৫ তম সূরা সূরায় ফাতিরের ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ـ

"আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামে) আগুনের আযাব। আর সেখানে তারা মরে যেতে পারবে না এবং আযাবের কিছু অংশও কমানো হবে না। আর এভাবেই আমি কাফিরদের প্রত্যেককে প্রতিদানের ব্যবস্থা করি থাকি।

৬. বিভিন্ন ব্যক্তিতে পার্থক্যের যৌক্তিক ধারণা

হিন্দুধর্মে, দুই ব্যক্তির জন্মে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার অতীত জীবনের কর্ম অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কাজের পার্থক্যের জন্য হয় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পুনর্জন্মের চক্রের কোন বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা হয় প্রমাণ নেই। ইসলামে কিভাবে এ পার্থক্যের ব্যাখ্যা করতে পারে ? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য সে সম্পর্কে ইসলামী ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআনের ৬৭ নং সূরা সূরায় মূলকের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে –

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ـ

"তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি জীবন এবং মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের মধ্যে কারো উত্তম কাজ বা পথ তা পরীক্ষা করতে পারেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাক্ষমাশীল।

অর্থাৎ আমাদের পার্থিব এ জীবন পরকালের পরীক্ষাক্ষেত্র মাত্র আর আমরা সবাই পরীক্ষার্থী।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে অদৃষ্ট এবং নিয়তি সর্ম্পকে ধারণা

১. নিয়তির ধারণা-ইসলামের তাকদীর ঃ

'ক্বদর' হচ্ছে নিয়তির ধারণা। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। যেমন, কোথায় এবং কখন একজন মানুষ জন্ম নিবে? কোন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে সে জন্ম নিবে? কত বছর সে হায়াত পাবে? এবং কোথায় ও কিভাবে সে মৃত্যুবরণ করবে? এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত।

২. হিন্দু ধর্মে নিয়তির ধারণা

হিন্দুধর্মে নিয়তির ধারণা বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ইসলামের অনুরূপ।

৩. বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে একটি পরীক্ষা

পবিত্র কোরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যাতে পরিষ্কার করে ঐ বিষয়সমূহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের পরীক্ষা করেন। পবিত্র কোরআনের ২৯তম সূরা সূরায় আনকাবুতের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে-

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ .

"মানুষেরা কি মনে করেছে যে, তারা বলবে, "আমরা ঈমান এনেছি"– আর এ কথা বলার সাথে সাথে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

সূরায়ে বাক্বারার ২১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত (পরীক্ষা) করে নেয়া হবে না? (অবশ্যই তা করা হবে) তাদেরকে দুর্ভোগ এবং দুর্ভিক্ষ বেষ্টণ করেছিল আর জমিন এমনভাবে প্রকম্পিত করে তোলা হয়েছিল যে, তাদের রাসূল এবং তাঁর সাথে যেসব ঈমানদারগণ ছিলেন সকলেই (সমস্বরে) বলেছিলেন, "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?" আহা! নিশ্চয়ই যদি আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী হত?"

সূরায়ে আম্বিয়ার ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ .

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে মন্দ এবং উত্তম জিনিস দ্বারা কঠোরভাবে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষা করব। আর আমার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে?"

সূরায়ে বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

"আর আমি অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে পরীক্ষা নিব ভয়, ক্ষুধা এবং ফলমূল, জীবন ও সম্পদের অনিষ্ট দ্বারা। আর আপনি (এসব ব্যাপারে) ধৈর্য ধারণকারীদের সুসংবাদ দিন।"

৮ম সূরা, সুরায়ে আনফালের ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

আর তোমরা নিশ্চিত জান তোমাদের সহায় সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর নিশ্চয় আল্লাহর কাছে উত্তম পুরস্কার রয়েছে।

৪. প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার উপরই বিচার করা হবে

প্রত্যেক মানুষকেই এ পৃথিবীতে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। এ পরীক্ষার ধরন ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কারণ, আল্লাহ ব্যক্তিকে যে সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রাখে তার ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষা করা হয়। আর তিনি তার বিচারও ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পন্ন করবেন। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন শিক্ষক একটি কঠিন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন, তাহাল সাধারণত তার উত্তরপত্র নমনীয়ভাবে দেখা হয়। কিন্তু , শিক্ষক যদি সহজ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেন তাহলে তার উত্তরপত্র সাধারণত কঠোরভাবে দেখেন।

অনুরূপভাবে কিছু কিছু মানুষ ধনী পরিবারে আবার কিছু কিছু মানুষ গরীব পরিবারে জন্ম নেন। এমন ধনী লোক যার বছরের যাবতীয় খরচের পর সঞ্চয়ের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণমূল্যের সমান হয়-ইসলাম ঐ সম্পদের ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রতি চন্দ্র বর্ষে দরিদ্রদেরকে প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এ পদ্ধতিটিকেই যাকাত বলা হয়। কিছু ধনী লোক সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে বাকীগুলো দান করে দিতে পারে,

আবার কিছু লোক প্রয়োজনের চেয়ে বেশি রেখে বাকীটা দান করতে পারে; আবার কিছু লোক মোটেই যাকাত আদায় করতে পারেন। এভাবে কোন ধনী লোক যাকাতের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দানের জন্য পূর্ণ নম্বর পেতে পারে। কেউ তার চেয়ে কম নম্বর পাবে; আবার অন্য কেউ ০ (শূন্য) নাম্বারও পেতে পারে। অন্যদিকে একজন দরিদ্র লোক যার ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ সঞ্চয় হয়েছে -সেও যাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে, কারণ এ লোকের জন্য যাকাত ফরজ হয়নি। সব মানুষই ধনী হতে চায় এবং কেউ দরিদ্র হতে চায় না। কেউ কেউ ধনী লোকদের প্রশংসা করে এবং গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। কিন্তু সে জানে না যে, একই সম্পদ যা ধনী ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে ঐ সম্পদের যাকাত না দেয়। আর সম্পত্তির কারণে সে লোভী চরিত্রের অধিকারীও হতে পারে। অন্যদিকে একজন গরীব মানুষের দরিদ্রতা তাকে নিঃসন্দেহে বেহশতে নিয়ে যেতে পারে, যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অন্য সকল নির্দেশাবলী পরিপূর্ণভাবে পালন করে। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। একজন ধনী লোক তার সম্পত্তি জনকল্যাণ ও মানবতার জন্য দান করার মাধ্যমে সহজে জান্নাত লাভ করতে পারে; আবার একজন গরীব লোক যে প্রবলভাবে মূল্যবান সম্পদের লালসা করে এবং তা পাওয়ার জন্য অনৈতিক পথে হাটতে পারে এতে সে শেষ বিচারের দিনে হয়ত সমস্যায় পড়ে যাবে।

৫. পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা তাদের পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

কিছু কিছু শিশু পৃথিবীতে সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসে আবার কিছু কিছু শিশু পঙ্গু হয়ে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। শিশু সুস্বাস্থ্য বা পঙ্গুত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করুক না কিনা ইসলামের দৃষ্টিতে সে নিষ্পাপ বা 'মাসুম'। এ ধরনের কোন কথা নেই যে, সে পূর্ববর্তী জীবনের পাপের কারণে সে পঙ্গু হয়ে জন্মেছে। এ ধরনের বিশ্বাস অন্যের প্রতি সহৃদয়বান হওয়ার গুণটিকে ধ্বংস করে দেবে। তাহলে অন্যরা বলতে পারবে যে, এ শিশুটি তার জন্মকে কলুষিত করেছে বা পঙ্গু হয়েছে কারণ এ পঙ্গুত্ব তার মন্দ কর্মের ফল।

ইসলাম বলেছে যে, এ ধরণের পঙ্গু শিশু তার পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা। তারা এ জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? তারা ধৈর্য ধারণ করে কি না? তারা উহাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে কি না? (এসব দেখার জন্য আল্লাহ তাদের ঘরে পঙ্গু সন্তান দেন।)

প্রচলিত একটি কথা আছে যে, "একজন লোক তার পায়ে পরার জুতা না থাকায় দুঃখিত হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণে সে একজন পা ছাড়া লোককে দেখল তখন তার দুঃখ থাকল না।"

পবিত্র কোরআনের ৮ম সূরা, সূরায়ে আনফালের ২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

"আর জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই তোমাদের সহায় সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।"

আল্লাহ তা'য়ালা পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ হন কি না? হতে পারে পিতা-মাতা সৎকর্ম সম্পাদন কারী, ধার্মিক এবং জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত। এখন আল্লাহ যদি তাদেরকে জান্নাতে উচ্চতর মর্যাদা দান করতে চান; তাহলে তিনি তাদের পুনরায় পরীক্ষা করে নিবেন। অর্থাৎ

তিনি তাদেরকে একটি পঙ্গু সন্তান দান করবেন। এরপর ও যদি তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হন, তাহলে তারা উচ্চতর পুরস্কারের জন্য অর্থাৎ জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য উপযুক্ত হয়ে যান।

একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, পরীক্ষা যত কঠিন হবে পুরস্কার ততই দামী হবে। কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে সম্মানের ডিগ্রী পাস করা তুলনামূলকভাবে সহজ আর যদি আপনি তা পাস করেন তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র গ্রাজুয়েট বলা হবে। কিন্তু আপনি যদি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী নিতে চান, যা অর্জন করতে তুলনামূলক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়-তাহলে আপনি গ্রাজুয়েট হওয়ার পাশাপাশি আপনাকে ডাক্তার বলা হবে এবং 'ডাঃ' উপাধিটি আপনার নামের পূর্বে জুড়ে দেয়া হবে।

একইভাবে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন, কাউকে স্বাস্থ্য দিয়ে, কাউকে রোগ দিয়ে, কাউকে অর্থ দিয়ে, কাউকে দারিদ্রতা দিয়ে, কাউকে তুলনামূলক বেশি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, কাউকে কম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এবং ব্যক্তিকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে তার দ্বারা এভাবে তিনি প্রত্যেককেই পরীক্ষা করে থাকেন।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, এ জীবন পরকালের জীবনের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্রমাত্র। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কোরআন এবং বেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিভেদে যে পার্থক্য দেখা দেয় সেটা আত্মার স্থানান্তর বা "সামসারা' অর্থাৎ অতীত জীবনের পাপের জন্য হয় না। এসব বিশ্বাসকে ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন- উপনিষদ, ভগবদ গীতা এবং পুরাণে পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছিল। জন্ম এবং মৃত্যুর পুর্নব্যক্ত চক্র সম্বন্ধে বৈদিক যুগে কিছু জানা ছিল না, শোনাও যায়নি।

এখন, আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে ইবাদত এবং জিহাদের ধারনার মধ্যে যেসব মিল পরিলক্ষিত হয় তা আলোচনা এবং যাচাই করে প্রকাশ করবো। আমরা ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করব।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে ইবাদতের ধারণা

ইসলামের রুকন বা ভিত্তি পাঁচটি

সহীহ বোখারীর ১ম খন্ডের ১ম অধ্যায়ের 'কিতাবুল ঈমানের' ৮নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–

"হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি। যেমন–

(১) এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ বা ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল;

(২) ইক্বামাতুস সালাত (নামায প্রতিষ্ঠা করা)

(৩) যাকাতা প্রদান করা;

(৪) রমযান মাসে রোযা রাখা এবং

(৫) হজ্জ পালন (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার ক্বাবায় গমন করা)

১. ঈমানের প্রামাণিক সাক্ষ্য

ইসলামের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে এই ঘোষণা করা, সত্যায়ন করা, সাক্ষ্য দেয়া এবং প্রমাণ বহন করা যে, আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্তা বা দেবতা ইবাদাতের, আনুগত্যের অভিবাদনের এবং আত্মসমর্পণ যোগ্য নন এবং এ

সাক্ষ্য দেয়া যে, মহানবী মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন মনোনীত সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী ও রাসূল। ঈমানের এ ভিত্তি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সালাত

ক. ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি বা রুকন হচ্ছে সালাত বা নামায

'সালাত' এর ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে Prayer বা প্রার্থনা। প্রার্থনা করার অর্থ হচ্ছে সাহায্য বা সহযোগিতা চাওয়া। নামাযে আমরা মুসলমানরা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য সহযোগিতা চাই না বরং আমরা তার প্রশংসা এবং তার কাছে হেদায়াতও কামনা করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে একে একটি ন্যায়বিচার হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করি। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, মনে করুন, নামাযের সূরায় ফাতিহার পরে, ইমাম সাহেব মহাগ্রন্থ কোরআনের ৫ম সূরা, সূরায়ে মায়িদার ৯০ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তিনি পড়লেন–

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পাথর (উৎসর্গীকৃত), এবং তীর ধনুক (যা দ্বারা বিভক্ত করা হয়) অপবিত্র এবং শয়তানের কারসাজি। অতএব তোমরা এসব হতে সাবধান থাকো। হয়ত এতে তোমরা সফলতাপ্রাপ্ত হবে।"

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত যা ইমাম সাহেব নামাযে তেলাওয়াত করলেন এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন যে, আমাদের মদ পান করা, জুয়া খেলা, মুর্তিপূজা এবং ভাগ্য গণনার কাজে অংশগ্রহণ উচিত নয়– এসব কাজই শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে থাকে এবং আমরা যদি সফলতা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে এসব কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রকৃত এবং পরিপূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকে 'সালাত' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Prayer' দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না।

খ. নামায ব্যক্তিকে অশ্লীল এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে

পবিত্র কুরআনের ২৯তম সূরা, সূরায়ে আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ۔

"আপনার নিকট যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা থেকে (আপনি) তেলাওয়াত করুন এবং নামায প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকির (জীবনের) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

গ. সুস্থ মনের অধিকারী হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায

একটি সুস্থ শরীর গড়ার জন্য যেমনি মানুষের প্রতিদিন তিনবার খাবারের প্রয়োজন হয়। তেমনি একটি সুস্থ মন গড়ার জন্য প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের ১৭তম সূরা, সূরায়ে ইসরার ৭৮ নং আয়াতে এবং ২০ তম সূরা সূরায়ে ত্ব-হার ১৩০ নং আয়াতের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচটি নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায়ের জন্য বলেছেন।

ঘ. সিজদা নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ

নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সিজদা। যেমন,

(i) পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা, সূরায়ে আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

"হে মরিয়ম! তোমার প্রভুর সামনে নত হও এবং সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"

(ii) পবিত্র কুরআনের ২২তম সূরা, সূরায়ে হাজ্জের ৭৭নং আয়াতে বলা হয়েছে –

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ" রুকু কর, সিজদা কর, তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সৎ কাজ কর। সম্ভবত এতে তোমরা সফলতাপ্রাপ্ত হবে।" (সিজ্দার আয়াত শাফেয়ী মাযহাব মতে)

হিন্দুধর্মের সাথে সামঞ্জস্যতা

হিন্দুধর্মে এক ধরনের প্রার্থনা হচ্ছে "ষষ্ঠাঙ্গ"

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা এবং উপাসনার মধ্যে অন্যতম উপাসনা ষষ্ঠাঙ্গ। 'ষষ্ঠাঙ্গ' শব্দটি 'Sa' এবং 'Asht' যার অর্থ 'আট' এবং 'Ang' যার অর্থ 'শরীরের অঙ্গ'–দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ 'ষষ্ঠাঙ্গ' এর অর্থ হচ্ছে উপাসনার এমন একটি রূপ যাতে শরীরের আটটি অঙ্গের স্পর্শ প্রয়োজন হয়। কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এ উপাসনা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে একজন মুসলমান তার সালাতে সিজদা করার সময় যে আটটি অঙ্গ অর্থাৎ, কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা ব্যবহার করেন তাকেও এগুলোর ব্যবহার করতে হবে।

হিন্দুধর্ম প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ করে

(i) প্রতিমাপূজা, যেটা হিন্দুধর্মের মাঝে খুবই সাধারণ একটি বিষয় বলে মানা হয় – এটাও হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ। ভগ্বদ গীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ ধারায় বলা হয়েছে–" ঐসব লোক যাদের বুদ্ধিমত্তাকে পার্থিব (সম্পদ) অর্জনের অভিপ্রায় দ্বারা হরণ করা হয়েছে তারাই প্রতিমা পূজায় লিপ্ত।"

(ii) সুবেটাসভাটারা উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৯ নং ধারায়ও এ কথা বর্ণিত রয়েছে।

(iii) ইয়াজুর বেদের ৩২তম অধ্যায়ের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে "তাঁর কোন প্রতিমা নেই।"

(iv) ইয়াজুর বেদের ৪০তম অধ্যায়ের ৯নং ধারায় বলা হয়েছো-" যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ (যেমন, বাতাস, পানি, অগ্নি, ইত্যাদি)-এর উপাসনায় লিপ্ত তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। আর যারা সৃষ্ট জিনিস (যেমন, টেবিল, চেয়ার, গাড়ী, প্রতিমা ইত্যাদি)-এর উপসনায় লিপ্ত তারাও অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে।"

যাকাত

ক. যাকাত অর্থ পবিত্রতা এবং প্রবৃদ্ধি

যাকাত ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি স্তম্ভ বা রুকন; যার অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন করা।

খ. ২.৫% দান করতে হয় ঃ প্রত্যেক ধনী মুসলমান বছরে যার সঞ্চয়কৃত অর্থের পরিমাণ কমপক্ষে নিসাব (৮৫ গ্রাম স্বর্ণ মূল্য বা এর সমান অর্থের মালিক) পররিমাণ তার উক্ত সম্পদের ২.৫% প্রতি বছর শেষে দান করা অবশ্য কর্তব্য।

গ. যদি সকল ধনী ব্যক্তি যাকাত দেয়-তাহলে কেউ ক্ষুধায় মারা যাবে না

যদি পৃথিবীর সকল ধনী লোক যথাযথভাবে যাকাত প্রদান করে তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্রতা চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। পৃথিবীতে এমন মানুষ পাওয়া যাবে না যে না খেয়ে মারা যাবে।

ঘ. যাকাত একথা নিশ্চিত করে যে সম্পদ কেবল ধনীদের হাতে থাকবে না

যাকাত ফরজ করার নানান কারণের মধ্যে একটি কারণ পবিত্র কুরআনের ৫৯তম সূরা, সূরায়ে হাশরের ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে−

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ـ

"সম্পদ যাতে কেবল ধনীদের মাঝে আবর্তিত হতে না পারে সেজন্য (যাকাত ফরয করা হয়েছে)....।"

ঙ. হিন্দুধর্মে দান ঃ হিন্দুধর্মেও নানা গ্রন্থে দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে-

(i) ঋগবেদের বই-১০ স্তুতিস্তাবক-১১৭. ধারা-৫ এ বলা হয়েছে− "ধনীদের উচিত গরীব ভিক্ষুকদের সন্তুষ্ট করা। আর তার চক্ষুকে দীর্ঘতর পথপানে আনমিত রাখা উচিৎ। এখন একজন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, এরপর অন্য একজন হবেন এবং গাড়ীর চাকার মত তা চিরকাল আবর্তিত হতে থাকবে।"

"যদি এরূপ আশা করা যায় যে, প্রত্যেক ধনী লোক গরীব ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করবে তাহলে ধনী লোককে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে (তাকে ভাবতে হবে আজকে সে ধনী আগামীকাল ধনী নাও থাকতে পারে) মনে রেখ যে, ধনী হিসেবে একজনের স্থানে অন্যজনের তেমনি আগমন ঘটে যেমনি সারথির চাকাসমূহ একটি স্থানের অন্যটির আগমন ঘটে।"

(ii) ভগবদ গীতার বেশ কয়েকটি জায়গায় দান করার ব্যাপারে বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, ১৭ তম অধ্যায়ের ২০ নং ধারা এবং ১৬ তম অধ্যায়ের ৩ নং ধারা।

৪. সিয়াম-রোযা

ক. সংজ্ঞা ঃ সিয়াম বা রোযা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ বা রূকন। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের আরবী মাস রমজানের পূর্ণমাস সুবহে সাদিক সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই রোযা।

খ. রোযা আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়

রোযা রাখার কারণ-পবিত্র কুরআনের ২য় সূরা, সূরা বাক্বারার ১৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের ওপর তা ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া লাভ করতে পার।"

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, যদি কোন লোক তার ক্ষুধাকে সংবরণ করতে পারে, তাহলে তার পক্ষে অধিকাংশ ইচ্ছাকে সংবরণ করা খুবই সহজসাধ্য।

গ. রোযা মদ্যপান, ধূমপান এবং অন্যান্য নেশাকে নিষিদ্ধ করে

পূর্ণ এক মাসে রোযা রাখার মাধ্যমে মন্দ অভ্যাসসমূহ পরিত্যাগ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ অর্জিত হয়। যদি একজন লোক সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মদ্যপান থেকে বিরত থাকে, তবে তার জন্য একদিনের পুরো ২৪ ঘণ্টা মদ্যপান ছাড়া থাকা খুবই সহজ হয়ে যায়। যদি একজন লোক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার জন্য সারা জীবন ধূমপান থেকে ভালোভাবে বিরত থাকা সহজ হবে।

ঘ. চিকিৎসাগত সুবিধা

রোযার নানান স্বাস্থ্যগত সুবিধা রয়েছে। রোযা অন্ত্রের শোষণ অক্ষতা বাড়ায়। এটা কোলেস্টরলের মাত্রাও কমায়।

ঙ. হিন্দু ধর্মে রোযা

হিন্দুধর্মে রোযার বিভিন্ন ধরণ এবং পদ্ধতি রয়েছে। মনুস্মৃতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে– "পবিত্রতা অর্জনের জন্য একমাস উপোষ উত্তম।" এ রোযা সম্পর্কে আরও বর্ণনা আছে-

মনুস্মৃতির ৪র্থ অধ্যায়ের ২২২ নং ধারায়

মনুস্মৃতির ১১ তম অধ্যায়ের ২০৪ নং ধারায়

৫. হজ্জ ক. সংজ্ঞা : হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ বা রুকন। প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমান যার হজ্জ করার সামর্থ আছে অর্থাৎ, পবিত্র নগরীর মক্কায় তীর্থযাত্রা করার যাবতীয় ব্যয় বহন করার সামর্থ আছে- তার জন্য জীবনে কমপক্ষে একবার হজ্জব্রত পালন করা ফরয।

খ. আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ : হজ্জ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং নির্দেশনা। হজ্জ হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বার্ষিক সম্মেলন যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ২.৫ মিলিয়নের অধিক লোক একত্রিত হয়। সকল তীর্থযাত্রীই দুই খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে। এ কাপড় সাধারণত সাদা হয়, এভাবে এটা এ জন্য পরানো হয় যাতে আপনি পার্থক্য করতে না পারেন যে, কে ধনী, কে দরিদ্র, কে রাজা, কে প্রজা। সকল গোত্রের এবং বর্ণের মানুষের একত্রে এক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যায়।

গ. হিন্দুধর্মের তীর্থযাত্রা : হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রার বিভিন্ন স্থানে নির্ধারিত আছে। এর মধ্যে অন্যতম জায়গা হচ্ছে–

(i) রিগ বেদের বই-৩, স্তুতিস্তাবক-২৯, ধারা-৪ এ বলা হয়েছে- "ইয়াসপদ যেটি নব পার্থবিতে অবস্থিত।" "Ila" অর্থ হচ্ছে প্রভু বা আল্লাহ এবং Spad" অর্থ হচ্ছে জায়গা। সুতরাং "Ilaspad" অর্থ হচ্ছে সৃষ্টি কর্তার স্থান। "Nabha" অর্থ হচ্ছে কেন্দ্র এবং "Prathvi" অর্থ হচ্ছে 'পৃথিবী' এভাবে বেদের এ ধারাটিতে তীর্থযাত্রার যে স্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেটি পৃথিবীর কেন্দ্রে মাঝখানে অবস্থিত।

M. Monier william কর্তৃক সংস্কৃত ইংরেজি অভিধানে (২০০২ সালে সংস্করণ) বরা হয়েছে, 'ইয়াসপদ' হচ্ছে 'তীর্থের নাম" অর্থাৎ, তীর্থযাত্রার স্থান। যাহোক, এর সঠিক অবস্থান বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি (তবে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলই এর মূল অর্থ)।

(ii) পবিত্র কুরআনের ৩য় সূরা, সূরায়ে আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই মানব জাতির (ইবাদতের) জন্য নির্মিত প্রথম ঘর সেটা মক্কায় অবস্থিত। আর এটি হচ্ছে পবিত্র গৃহ এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতের দিশারীস্বরূপ।"

'বাক্কা' হচ্ছে মক্কা নগরীর অন্যতম উপনাম এবং আমরা আজ জানি যে 'মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।"

পরবর্তী সাতটি ধারায় বলা হয়েছে–

(iii) রিগ বেদের বই-৩, স্তুতিস্তাবক ২৯, ধারা-১১ তে মহানবী মুহাম্মদ (সা)-কে 'নরসঞ্চা' হিসেবে অবহিত করা হয়েছে।

এভাবে পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, এ ইয়াসপদ তথা তীর্থযাত্রার স্থান-যা ঋগবেদে উল্লেখিত হয়েছে-তা হচ্ছে মক্কা নগরী।

(iv) মক্কাকে ইয়াসপদ হিসেবে ঋগবেদের বই-১, স্তুতিস্তাবক-১২৮ এবং ধারা-১ এও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মে জিহাদের ধারণা

ইসলাম সম্পর্কে শুধু অমুসলিমদের মধ্যে নয় বরং মুসলমানদের মধ্যেও একটি বড় ভুল ধারণা প্রচলিত যে, ইসলাম জিহাদকে সমর্থন করে। অমুসলিম এবং মুসলিম ধারণা করে যে, মুসলমানদের দ্বারা যে কোন উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুদ্ধ হোকনা কেন ভালো কিংবা মন্দ-সবই জিহাদ।

'জিহাদ' আরবি শব্দ, যা 'জাহাদা' শব্দ থেকে এসেছে। আর 'জাহাদা' অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা বা সংগ্রাম করা অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একজন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার প্রাণপণ চেষ্টা করে তাহলে সেও 'জাহাদা' করছে।

ইসলামী পরিভাষায়, 'জিহাদ' অর্থ হচ্ছে কারো নিজের মন্দ বা খারাপ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, সমাজকে উন্নততর করার চেষ্টার নাম জিহাদ। এর দ্বারা আত্মরক্ষার সংগাম কিংবা যুদ্ধের ময়দানে আগ্রাসন কিংবা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করাকেও বুঝায়।

১. জিহাদ পবিত্র যুদ্ধ নয় ঃ শুধুমাত্র অমুসলিম পন্ডিতরাই নন বরং বহু মুসলিম পণ্ডিতও পর্যন্ত 'জিহাদ' শব্দের ভুল অর্থ করে বলেন যে এর অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু 'পবিত্র যুদ্ধের আরবি শব্দ হচ্ছে 'হারবুন মুকাদ্দাসুন' এবং পবিত্র কুরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় না।

'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত ক্রুসেডের সময়-যাতে তারা খ্রিস্ট ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে। বর্তমানে এ পবিত্র যুদ্ধ শব্দটি অন্যায়ভাবে জিহাদকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ, 'জিহাদ অর্থ হচ্ছে প্রাণান্তকর চেষ্টা করা'। ইসলামের পরিভাষা হচ্ছে-"সঠিক কারণে আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করাকে জিহাদ বলে।" যেমন, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

২. বিভিন্ন রকম জিহাদের মধ্যে একটিমাত্র ধরণ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা

বিভিন্ন ধরণের জিহাদ ঃ জিহাদের একটি ধরণ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নির্যাতন এবং হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা।

অরুন শূরীসহ কতিপয় ইসলামের সমালোচক পবিত্র কুরআনের ৯ম সূরা, সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের কথা উল্লেখ করেন। আযাতে বলা হয়েছে–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ ـ

"...মুশরিকও কাফিরদের হত্যা করো, যেখানে তোমরা তাদেরকে পাও...।"

যদি আপনি কুরআন তেলাওয়াত করেন তাহলে এ আয়াতটি পাবেন কিন্তু-অরুন শূরী এটিকে প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করেছেন।

সূরায়ে তওবার ৫ম আয়াতের পূর্বের কয়েকটি আয়াতে মুসলমানগণ এবং মক্কার মুশরিকদের যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ শান্তি চুক্তি একতরফাভাবে মক্কার মুশরিকদের দ্বারা লংঘিত হয়েছিল। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য চার মাসের চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেন নতুবা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ঘোষণা দেন। আর তাই আল্লাহ তা'য়ালা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "সংগ্রাম করো এবং মুশরিকদের (মক্কার শত্রুদের) যেখানে পাও সেখানেই তাদেরকে হত্যা করো এবং তাদেরকে ধরো এবং বন্দী করো। আর তাদের জন্য যুদ্ধের প্রতিটি সুবিধাজনক স্থানে উৎপেতে অপেক্ষা করো।"

এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে প্রাণান্ত লড়াই করো এবং তাদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো। যুদ্ধক্ষেত্রের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, কারণ সেনাবাহিনীর যে কোন সেনাপতি সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এবং তাদের উৎসাহ দেয়ায় জন্য বলবে, "দুর্বল হয়ো না, লড়াই করো এবং শত্রুদের হত্যা করো তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে যেখানেই দেখতে পাও।" অরুণ শূরী তার বই "The world of fatwas"-এ সূরা তাওবার ৫নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তারপর ৬নং আয়াত উল্লেখ না করে এক লাফে ৭নং আয়াতে চলে গেছেন। যে কোন যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই বুঝতে পারবে যে, ৬নং আয়াত হচ্ছে এ অভিযোগের উত্তর। সূরা তওবার ৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ـ

"তবে যদি কোন মুশরিক (শত্রুদের কেউ) তোমাদের কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও যাতে সে আল্লাহর বাণী শোনার সুযোগ পায় এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও।"

বর্তমানে সবচেয়ে দয়ালু সেনাপতি তার সৈন্যদের শত্রুদের ছেড়ে দিতে বলতে পারে না। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যদি শত্রুরা শান্তি চায় তাদেরকে শুধু ছেড়ে দিতে বলেন নি বরং নিরাপদ স্থানে পৌছে দিতে বলেছেন। বর্তমান যুগে অথবা সমগ্র মানব ইতিহাস থেকে এমন কোন সেনাপতির কথা আনা যায় কি যিনি কখনও এমন দয়ার্দ্র নির্দেশ দিয়েছেন? আমরা এখন অরুন শূরীর কাছে জানতে চাই তিনি কেন ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিলেন না?

৩. ভগ্বদ গীতায় জিহাদের কথা উল্লেখ আছে

প্রত্যেক প্রধান ধর্মই তার অনুসরণকারীদের ভালো কাজের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করতে বলেছে। ভগ্বদগীতার ২:৫০ নং ধারায় বর্ণিত আছে–"অতএব হে মুমিন! আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করো-যেটা হচ্ছে সকল কাজের কলা-কৌশল।"

৪. লড়াইয়ের কথা ভগ্বদগীতায়ও উল্লেখ আছে

(ক) আত্মরক্ষা কিংবা নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই বা সংগ্রামের জন্য পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মহাভারত একটি মহাকাব্য এবং হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে দুই চাচাত ভাই- পান্ডবাস এবং কৌরাভাসের মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনীই প্রধানভাবে আলোচিত হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানের অর্জুন যুদ্ধ করাকে পছন্দ করেনি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পর তাকে নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে হত্যা করা হয়। এমন মুহূর্তে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের ময়দানে উপদেশাবলী শোনান এবং এ উপদেশাবলীই ভগ্বদগীতায় বর্ণিত হয়েছে। ভগ্বদগীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের শত্রুপক্ষ আত্মীয় হলেও হত্যা করার উপদেশ দিয়েছেন।

(খ) ভগ্বদগীতায় ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৪৬ ধারায় বলা হয়েছে–

(৪৩) "হে কৃষ্ণ! জনগণকে রক্ষা করো। আমি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে জেনেছি যে, যারা পারিবারিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করে তারা সর্বদা নরকে বাস করবে।"

(৪৪) হায়! কি আশ্চর্যের কথা যে আমরা নিজেদের পাপাচারমূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করেছি। এ ধারণা রাজকীয় সুখ অর্জনের অভিলাষ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

(৪৫) "ধ্রীতারাষ্ট্রের ছেলেরা আমাকে নির্দয়ভাবে এবং বিনাবাধায় হত্যা করার চেয়ে আমি বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অধিকতর শ্রেয় মনে করি।"

(গ) কৃষ্ণের পিতা ভগ্বদগীতার ২য় অধ্যায়ের ২-৩ ধারায় যে জবাব দিয়েছিলেন তাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) কৃষ্ণের পিতা ভগ্বদগীতায় ২য় অধ্যায়ের ৩১-৩৩ ধারার যা বলেছেন তাতে যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে।

(ঙ) শুধুমাত্র ভগ্বদগীতায়ই এমন শত শত ধারা রয়েছে যেগুলোতে যুদ্ধ এবং হত্যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সময় এসব ধারাগুলোকে কোরআনের আয়াতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনে করুন, এখন যদি কেউ এভাবে বলেন যে, ভগ্বদ গীতায় স্বর্গলাভের জন্য পরিবারের সদস্যদের হত্যা করতে বলা হয়েছে এবং সে গীতা থেকে যথার্থ অংশের উদ্ধৃতি না দেন তাহলে এ ধরনের কথা বিতর্কের সৃষ্টি করবে। কিন্তু উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে কেউ যদি বলেন যে, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য যদ্ধ করা জরুরী যদি তা তোমার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে হয় তবুও – তাহলে এ বর্ণনা সবাই সহজেই বুঝতে পারবেন।

ইসলামের সমালোচকগণ বিশেষ করে হিন্দু সমালোচকগণ যখন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ও হত্যার দিকে তাদের আঙ্গুল তুলেন তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। এর সম্ভাব্য কারণ, তারা হয়তো তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ যথাযথভাবে অধ্যায়ন করেননি। যেমন, ভগ্বদগীতা, মহাভারত এবং বেদ।

(চ) হিন্দুধর্মাবলম্বীসহ ইসলামের সমলোচনাকারীগণ কোরআন এবং নবী (সা)- এর বিরুদ্ধে যখন বলেন, এতে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি জিহাদের ময়দানে নিহত হও, তাহলে জেন তুমি নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারা এক্ষত্রে সহীহ বোখারীর ৪র্থ খন্ডের কিতাবুল জিহাদের ৪৬ নং হাদীসের উদ্ধৃতি এনে বলেন, আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তিনি শাহাদাতবরণকারী মুজাহিদদেরকে জান্নাতে স্থান দিবেন নতুবা তাদেরকে সহীহ ছালামতে পুরস্কারসহ বাড়ীতে পৌছিয়ে দিবেন।

ভগবদগীতার একাধিক ধারায় যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। যেমন, ভগবদ গীতায় ২য় অধ্যায়ের ৩৭ নং ধারায় বলা হয়েছে–

"হে কুন্তির সন্তান, হয়তো তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে, নতুবা বিশ্বরাজ্য জয় করে তা ভোগ করবে। সুতরাং জেগে ওঠো এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

(ছ) একইভাবে রিগ বেদের বই- ১, স্তুতিস্তাবক- ১৩২, ধারা ২৬ এবং আরও কতিপয় হিন্দুধর্মগ্রন্থে যুদ্ধ এবং হত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫. অন্যধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে জিহাদের ব্যাখ্যা

আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনের তৃতীয় সূরা সূরায়ে আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াতে বলেছেন,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ

অর্থাৎ "হে নবী বলুন, এমন বিষয়ের যেগুলো তোমাদের এবং আমাদের উভয়েরই জন্যই সমান।"

ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা দুর করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ যেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ বাণী আছে তার উদ্ধৃতি দেয়া।

যখন আমি একজন হিন্দুর সাথে কথা বলবো যে ইসলামে জিহাদের সমর্থনের সমালোচক, তখন আমি মহাভারতে এবং ভব গীতার সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বর্ণনা রয়েছে তার উদ্ধৃতি দিব। কারণ, মহাভারতে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে বর্ণনা এবং নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা খুব ভাল জানেন। এতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে কোরআনের বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে বলবে যে, কোরআন যদি সত্য এবং মিথ্যার মাঝে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ দেয় তবে এতে তাদের কোনরূপ আপত্তি নেই এবং তারা কোরআনে বর্ণিত সহানুভূতির প্রশংসা করবে।

কুরআন এবং বেদের বর্ণনার সামঞ্জস্যতা

বেদে এমন অনেক ধারা রয়েছে যেগুলোর অর্থ কোরআনের আয়াতের অর্থের স্যথে মিল রয়েছে। যেমন ঃ

ইসলাম ধর্ম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

(১) সমস্ত প্রশংসা জগতের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। -সূরা ফাতিহা ঃ ২

(২) তিনি অত্যন্ত পরম দয়ালু, মহা দয়াবান। -সূরা ফাতিহা ঃ ৩

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

(৩) আমাদেরকে সঠিক বা সহজ পথ দান করুন তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন, তাদের পথ নয় যারা বিপথগামী এবং যাদের প্রতি আপনার ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে। -সূরা ফাতিহা, আয়াত ৬ ঃ ৭

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ

(৪) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিনকে অস্বীকার করে? অতঃপর সে তো ঐ লোক যে ইয়াতিমদের গলা ধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করে এবং ইয়াতিমকে খাবার দানে উৎসাহী হয় না। –সূরা মাউন ঃ ১-৩

হিন্দু ধর্ম

(১) নিশ্চয়ই স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার জন্য বৃহৎ গৌরব নির্ধারিত। -রিগ বেদ ৫ ঃ ৮১-১

(২) সবচেয়ে বেশি দয়ার আধার। -রিগ বেদ ৩ ঃ ৩৪ ঃ ১

(৩) আমাদেরকে উত্তম পথে চালিত করুন এবং পাপাচার হতে মুক্তি দিন– যা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং বিপথে পতিত করে। - ইয়াজুর বেদ ৪০ঃ ১৬ একই বাণী রিগ বেদের বই-১, স্তুতিস্তাবক- ১৮৯, ধারা ১,২-এ বলা হয়েছে।

(৪) ঐ লোক যার কাছে খাদ্য মওজুদ আছে, যখন কোন অভাবী অসহায় লোক তার কাছে খাদ্য ভিক্ষা চায় তখন তার অন্তর ঐ লোকের জন্য কঠোর হয়ে যায় এমনকি যদি কোন বৃদ্ধ লোকও তাকে কাজ করে দেয়, কাউকেই সে শান্তি দেয় না। -রিগ বেদ ১০ ঃ ১১৭ ঃ ২

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের শিক্ষার মধ্যে মিলসমূহ

১. মদ নিষিদ্ধ ঃ

(ক) পবিত্র কোআনের ৫ম সূরা, সূরায়ে মায়েদার ৯০ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া (উৎসর্গীকৃত) পাথর, তীর-ধনুক (যা দ্বারা বিভক্তি করা হয়) নিশ্চয় অপবিত্র এবং শয়তানের প্ররোচনা মাত্র। এগুলো থেকে বিরত থাকলে তোমরা সফল হতে পারবে।

(খ) বর্ণিত আছে (i) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে-

"আত্মহত্যাকারী, মদ্যপানকারী, চোর এবং গুরুজনের স্ত্রীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকারী এদের সবাই প্রতারক এবং আলাদাভাবে মহাপাপী হিসেবে বিবেচিত।

দুটি ধারায় বলা হয়েছে ঃ

(ii) মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায় ঃ ২৩৮ নং ধারা

"এসব মহাপাপী লোক এদের সাথে কারো একত্রে পানাহার করা উচিত নয়। এদের জন্য কারো কোন কিছু ত্যাগ করা উচিত নয়। এদের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত নয় এবং এদেরকে কারো বিবাহ করা উচিত নয়। এদেরকে পৃথিবীর সব ধর্ম থেকেই বহিষ্কার করা উচিত।

(iii) প্রায় একই কথা বলা হয়েছে মনুস্মৃতির ১১ তম অধ্যায়ের ৫৫ নং ধারায় "শিকারী প্রাণীকে হত্যাকারী, মদ্যপানকারী, চোর, গুরুর বিবাহিত স্ত্রীর সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকারী এবং এসব কাজের লিপ্ত লোকদেরকে অবশ্যই মহাপাপী হিসেবে বিবেচনা করা হবে।"

(iv) মনুস্মৃতির ১১তম অধ্যায়ের ৯৪ নং ধারায়ও একই কথা বলা হয়েছে।

গ. মনুস্মৃতির বেশ কয়েকটি জায়গায় মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন,

(i) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৩ ধারা-১৫৯

(ii) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৭ ধারা-৪৭

(iii) মনুস্মৃতির অধ্যায়-৯ ধারা-২২৫
(iv) মনুস্মৃতির অধ্যায়-১১ ধারা-১৫১
(v) মনুস্মৃতির অধ্যায়-১২ ধারা-৪৫
(vi) রিগ বেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২, ধারা-১২
(vii) রিগ বেদ বই-৮, স্তুতিস্তাবক-২১, ধারা-১৪

২. জুয়া নিষিদ্ধ ঃ

পবিত্র কোরআনের ৫ম সূরা, সূরায়ে মায়েদার ৯০ নং আয়াতে বর্নিত আছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

ক. বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, রিগ বেদের বই - ১০, স্তুতিস্তাবক - ৩৪ এ বলা হয়েছে।

"একজন জুয়াড়ী লোক বলে, আমার স্ত্রী আমার সাথে শত্রুভাবাপন্ন, আমার মা আমাকে ঘৃণা করে। এসব উন্মাদ লোক কাউকে সহ্য করতে পারে না।"

রিগ বেদের ১০ ঃ ৩৪ ঃ ১৩ ধারায় আরও বর্ণিত আছে –

"তাস খেলো না, অনুর্বর জমি চাষ করো না, লাভবান হও এবং মনে রেখ যে, প্রচুর সম্পদ লাভ করবে।

মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৫০ নং ধারায় বর্ণিত আছে।

"মদ্যপান, জুয়া খেলা, স্ত্রীলোক (বিবাহবহির্ভূত) এবং শিকার করা এবং যে তার জানা অনুচিত এদের শ্রেণী হচ্ছে পাপী।"

খ. মদ্য পানকে নিম্নোক্ত ধারাগুলোতেও নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

i) মনুস্মৃতির ৭ম অধ্যায়ের ৪৭ নং ধারা
ii) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২২১ - ২২৮ নং এর ধারা
iii) মনুস্মৃতির ৯ম অধ্যায়ের ২৫৮ নং ধারা।

সমাপনী বক্তব্য

এ গবেষণাকর্মটি মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান প্রভুর বাণীর অধিকতর নিকটে আসতে এবং এর মর্মোদ্ধার করতে সহায়তা করবে-ইনশাআল্লাহ। এ বইটি শুধুমাত্র বরফগলানোর কাজে কয়েকটি নির্দেশিকা। কিছু লোককে বোঝাতে দশটি ইশারা আবার কিছু লোককে বোঝাতে একশটি ইশারা যথেষ্ট। আবার কিছু লোককে হাজারো ইশারা দেয়ার পরও সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করবে। পবিত্র কোরআন এর ২য় সূরা, সূরায়ে বাক্বারার ১৮নং আয়াতে এসব বদ্ধ মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সম্পর্কে বলেছে– صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

"এরা বোবা, কানা, এবং অন্ধ (এরা সত্য পথে) ফিরেনা।

সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র একক স্রষ্টা আল্লাহর জন্য, যিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন মাবুদ নেই, যাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও ইবাদত করা যায়। আমি প্রার্থনা করি যেন, এ বিনয়ী কাজটি তিনি কবুল করে নেন। আর তাঁর নিকটই ক্ষমা এবং হেদায়াত কামনা করছি।